

www.banglainternet.com

LES MISERABLE

Victor Hugo

[Bangla Translation]

ভিক্টোর হুগো'র

লা-মিজারেবল

banglainternet.com

banglainternet.com

সেটা আঠারো শতকের কথা। দক্ষিণ ফ্রান্সের ব্রাই প্রদেশের একটি ছোট কুটির থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এই কাহিনী। ব্রাই প্রদেশের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছিল একটি শিশু। তার নাম জাঁ ভালজাঁ। তার বাবা ছিলো বড্ড গরীব। স্ত্রী, ভালজাঁ আর এক মেয়ে—এই নিয়ে ছোট সংসার। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল; তবু এই ছোট সংসারের ভরণপোষণের ব্যাপারেই ভালজাঁর বাবা হিমসিন খেয়ে যেতো।

জাঁ ভালজাঁকে ছোট রেখে তার মা মারা যায়। অভাবে বিনে চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছিল। বাবা ছিল কাঠুরে। স্ত্রীর মৃত্যুর ক'দিন পর গাছ থেকে পড়ে গিয়ে সেও মারা গেল। সংসারে আপন একমাত্র বোন ছাড়া জাঁ ভালজাঁর তখন আর কেই নেই। অসহায় ভালজাঁ বোনের সংসারে আশ্রয় পেলো। দারিদ্র আর দুর্বিপাকে জাঁ ভালজাঁর লেখাপড়া শেখা হলো না।

ভালজাঁর বয়স যখন পঁচিশ। কয়েকদিনের অসুখে হঠাৎ ভালজাঁর ভগ্নিপতি মারা গেল। ভগ্নিপতি আর ভালজাঁর আয়ে সংসারটি কোন রকম চলে যেতো। ভালজাঁ দিন মজুরী করে সামান্য কিছু রোজগার করতো। এবার ভগ্নিপতির মৃত্যুতে ভালজাঁ যেন সমুদ্রে পড়ল। বিধবা বোন আর ছোট-ছোট সাতটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাকে মাথা পেতে নিতে হলো। ভাগ্যেদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির বয়স তখন মাত্র আট।

যৌবনের সব স্বপ্নসাধ প্রায় বিলীন হয়ে গেলো ভালজাঁর। সংসার চালাবার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করছে। তবু দু'বেলা খাবার জোটে না। ফ্রান্সে তখন খাদ্যের চড়া দাম ও অভাব।

বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে ভালজাঁ সব দুঃখ-বেদনা হাসিমুখে সহ্য করে যায়। বাবার পেশা গাছীর কাজকেই ভালজাঁ বেছে নিয়েছিল। তার বোনও টুকটাক কাজ করতো কিন্তু দু'জনের যা রোজগার, তাতে দু'বেলা খাবার জোটে না। দিনমজুরী, খেতে-খামারে কাজ, ঘাস শুকানো, গরু চরানোর বাড়তি কাজ শুরু করলো ভালজাঁ। এতে সামান্য কিছু রোজগার বাড়লো কিন্তু অবস্থার তেমন হেরফের হলো না। এদিকে বোনও কেমন সব দিন-দিন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। ভালজাঁর রোজগারের সব পয়সা হাতিয়ে নেয়ার জন্য তার চেঁচা। ভালজাঁরও তা' নজর এড়ায় না। আগের মত আন্তরিকতা বোনের নেই। ভালজাঁ এর কোন প্রতিবাদ করে না। এদিকে অভাব দিন-দিন বেশিই হচ্ছে। অশান্তি বাড়ছে। ভালজাঁর মাথা ঠিক রাখাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেবার দক্ষিণ ফ্রান্সে খুব শীত পড়লো। শীতের জন্য বাইরের কাজকর্ম গেল থেমে। কাঠ কেটে আর আগের মতো রোজগার হয় না। অন্য কোন কাজও মিলছে না ভালজাঁর। অবস্থা দিন-দিন কঠিন হয়ে উঠলো।

পর-পর কয়েকদিন ভালজা কোন কাজ পেল না। এক টুকরো রুটি যোগাড় করাও কঠিন অবস্থা। না খেতে পেয়ে বোনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে নিজেদের মতো পড়ে রয়েছে। দরোজায়-দরোজায় ভালজা সাহায্যের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল চেষ্টা।

রোববারের সাপ্তাহিক ছুটির এক রাতে মহল্লার মনোহারী দোকানী সবেমাত্র দোকানপাট বন্ধ করে ঘুমোবার আয়োজন করছে—এমন সময় সে চমকে উঠলো। কি ব্যাপার! দোকানের পাশের কাঁচে কিসের যেন আওয়াজ হলো। দোকানী চুপি-চুপি পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলো শোবার ঘর থেকে। বেরিয়ে সে দেখতে পেলো দোকানের কাঁচের একটি বন্ধ জানালার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জানালার কাঁচের একটি পাল্লা ভেদে ফেলেছে লোকটি। ফাঁকরের মধ্যে হাত দিয়ে সে একটি পাউরুটি বের করে নিল। তার হাত কাঁপছে। চারিদিকে ভীত-চকিতভাবে তাকালো লোকটি, তারপর সে জোরে হাঁটতে শুরু করলো।

দোকানী চুপ করে দাঁড়িয়ে লোকটির কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। লোকটি দোকান ছেড়ে পা বাড়াতোই চোর-চোর বলে চিৎকার করে তার পিছু ধাওয়া শুরু হলো দোকানীর। এদিকে লোকটিও দোকানীর হাঁকডাক শুনে ছুটতে শুরু করেছে। বার-বার সে হোঁচট খাচ্ছিলো। সে রাস্তায় মুখ খুবড়ে পড়লো। দোকানী দৌড়ে এসে লোকটির চুপ চেপে ধরলো। লোকটি তার হাতের রুটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ততক্ষণে সেখানে লোকজন এসে জমেছে। এদের মধ্যে একজন বললো,—বাটি কে হে, আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দাও ওকে!

সমানে কিলঘুঘি পড়তে লাগলো। লোকটির ডান হাত দিয়ে তখনো রক্ত ঝরছে। কাঁচের জানালা ভাঙতে গিয়ে তার হাতের স্থানে-স্থানে কেটে গেছে। রক্তমাখা সেই হাত তুলে সে বললো,—আজ তিন চার দিন কিছু খেতে পাইনি। ঘরে সাতটি ছোট ছেলে-মেয়ে। আমি তাদের বলেছি, আজ তাদের জন্য রুটি এনে দেবই।

তার কথায় কেউ কান দিল না। উল্টো আরও বেশি কিলঘুঘি পড়তে লাগলো তার উপর। এ লোকটিই জাঁ ভালজা।

আদালতে হাজির করা হলো ভালজাকে চুরি করার অপরাধে। তার সশ্রম কারাদণ্ড হলো পাঁচ বছরের।

ভালজার স্বভাব ছিল অদ্ভুত। কোমলে-কঠোরে গড়া তার মন। খুব চিন্তিত থাকলেও তাকে দেখে তা বুঝা যেতনা। সে যে খুব বেশি উদ্ভিগ্ন বা বিষন্ন হয়ে পড়েছে, তাও কখনো মনে হতো না। মনে হতো, কোন কিছুতেই বুঝি তার উৎসাহ নেই। সাধারণ চেহারা, তাতে নেই কোন বুদ্ধির প্রতিকলন। কিন্তু কারাদণ্ডের আদেশ শোনার সময় তার চোখ দুটো যেন একবার জ্বলে উঠেছিলো।

তুলোই কারাগারে পাঠানো হবে ভালজাকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

কারাগারে পাঠানোর আগে ভালজার শরীরে যখন লোহার বেড়ী পরিয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন সে আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠেছিলো সে গরীব। তার জীবনে যে দুর্ঘোষ

নেমে এসেছে, তার ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে সে বারবার শিউরে উঠছিল। কান্নায় তার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্দতে-কান্দতে সে বলেছিল,—সে সামান্য এক গরীব কাঠুরে। ফেবারুয়ারে সে কাজ করতো। ভালজা তার ডান হাত শূন্যে উঠিয়ে কি যেন বলতে চাচ্ছিলো। শূন্যে সাতটি অদৃশ্য বস্তুর উপর সে যেন হাত বুলিয়ে। মনে হচ্ছিল, সে যেন সাতটি ছোট বড় ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে চাইছে,—আমি অন্যায় করেছি সত্যি, কিন্তু তা আমার নিজের জন্য নয়—অন্যায় করেছি আমার বোনের সাতটি ক্ষুধার্ত অথুখ দেবতুল্য ছেলেমেয়ের জন্যে।

সাতাশদিন পর তুলোই কারাগারে পৌছোলো ভালজা। গলার লোহার শিকল পায়ের লাল জামা। কয়েদী নম্বর ২৪৬০১ জাঁ ভালজার গুরু হলো কারা জীবন। ভালজার বোনের কি অবস্থা হলো, আমরা কেউ তা জানি না। সহায় সঞ্চলহীন সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ভালজার আশ্রয়কেই সে আঁকড়ে ধরেছিল। তার সে আশ্রয় টুটে গেল, তারা দেশান্তরী হল। ভালজা সেটা জানতেও পারলো না—তারা কোথায় গেল।

কারাগারের কঠিন দেয়ালে ভালজার সব দুঃখ, বেদনা, কামনা, আর্তি মাথা কুটতে লাগলো। কারাগারের দেয়াল ভালজার মনের দুরারও এঁটে দিতে লাগলো। মন থেকে তার বোন আর তার ছেলেমেয়েদের স্মৃতি মুছে যেতে লাগলো দিন-দিন।

কারাবাসের চতুর্থ বৎসর চলেছে। ভালজা খবর পেল, তার বোন তখন পুরনো প্যারিসে রয়েছে। প্যারিসের এক অতি সাধারণ বস্তিতে বাস করে। তার সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছয়টির কোন খবর নেই—জীবন সংগ্রামে ছ'টি ক্ষুদ্রে ছেলেমেয়ে যে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে, তা কেউ বলতে পারে না। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের কাছে থাকে। ছোট ছেলেটির বয়স তখন সাত বছর। ভালজার বোন এক ছাপাখানায় কাজ করে। ছেলেটিকে ছাপাখানার লাগোয়া এক ইকুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে।

বোনের খবর পেয়ে তার মনের মধ্যে পুরনো ব্যথা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কারাবাসের চতুর্থ বছরের শেষের দিকে সে অন্য কয়েদীদের সাহায্যে কারাগার থেকে পালালো। দুটো দিন ভীতসন্ত্রস্তভাবে এখানে-সেখানে সে পালিয়ে বেড়ালো। এই দু'দিন সে কিছু খায়নি, একটুও ঘুমোয়নি। এই দু'দিন তার দারুণ ভয়ে-ভয়ে কেটে গেল। সামান্য শব্দ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, অশ্বের খুরধ্বনি, উদ্গত চিম্নীর ধোঁয়া—সব কিছুতেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। অবশেষে পলায়নের পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সে ধরা পড়লো। কারাগার থেকে পালাবার অপরাধের জন্যে বিশেষ বিচার হলো তার।

কারাবাসের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো, সবমিলিয়ে তার মেয়াদ দাঁড়ালো আট বৎসর। ছ'বছরের মাথায় সে আবার পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সাধা হাজিরা ডাকার সময় রক্ষীরা টের পেয়ে গেল। কারাগারে পড়ে গেল পাগলা ঘণ্টা, চললো বোজ। রাতের বেলাতেই ধরা পড়লো ভালজা। সে এক জাহাজের মধ্যে পালিয়েছিল; রক্ষীরা যখন তাকে ধরতে যায়, তখন সে প্রথমে পালাবার চেষ্টা করে।

পরে নিরাপায় হয়ে সে গ্রহস্রীদের হাতে ধরা দেয়। বিচারে তার কারাবাসের মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো। এ ছাড়া বাড়তি শাস্তিরূপে দুটি প্রকাণ্ড বেড়ী দু'বছরের জন্য গলায় পরাবার আদেশ হলো।

কারাবাসের যখন দশ বছর চলছে, তখন তৃতীয়বার ভালজা পলায়নের চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারও সে ধরা পড়ে গেল। শাস্তিরূপে কারাবাসের মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়া হলো ভালজার। কারাবাসের ত্রয়োদশ বছরে আবার পালাবার চেষ্টা করলো ভালজা—চারঘণ্টার মধ্যে সে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। ফলে কারাবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হলো আরও তিন বছর। সব মিলিয়ে উনিশ বছর।

উনিশ বছর কারাবাসের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে বেরিয়ে এলো জাঁ ভালজা। সে বেরিয়ে এলো এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। ক্রান্তি আর অবসাদে তার আত্মা দু'চোখ। তার মুখে গভীর, হৃদয়ে সমাজের উপরতলায় সুখী-ধনী মানুষের প্রতি প্রবল ঘৃণাবোধ। ভালজার বয়স তখন চল্লিশ।

কারাগারে থাকাকালে ভালজা লেখাপড়া শিখেছে। সে কয়েদীদের ইকুলে ভর্তি হয়েছিল।

১৮১৫ সালের অক্টোবর মাসের একটি দিন। সূর্য তখন ডুবু-ডুবু করছে। ফরাসী দেশের ছোট একটি শহর 'ভি'র একটি পথ দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে একটি লোক। মনে হয় ভীষণ পরিশ্রান্ত। লোকটির মজবুত বাঁধুনির শরীর। বয়সে সে প্রৌঢ়। জীর্ণ মলিন বিচিত্র রঙ্গের তালিযুক্ত তার পরনের পোশাক। পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে একটি প্রকাণ্ড লাঠি। লোকটির সারা গায়ে ভল্লকের মতো ঘিচঘিচে লোম। খ্যাংড়া নাক। চাপটা মুখে একবোঝা দাড়ি। মাথার চুলগুলো কদম ফুলের মত ছাঁট—সব মিলিয়ে অদ্ভুত। লোকটির পিঠে একটি মাথারি ধরনের পোটলা।

পথ চলতে-চলতে একটি হোটেল দেখে দাঁড়ালো সে। কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর দরোজা ঠেলে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ল। যে ঘরে প্রবেশ করলো, সেটাই হোটেলের খাবার ঘর, হোটেলওয়াল ক্যাশবাক্স নিয়ে এই ঘরে বসে সব জিনিসের তদারকী করে। ঘরটির একপাশে চুলো। গনগনে আগুন জ্বলছে, পাশের আরেকটি ঘর থেকে কিছু লোকের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

বিচিত্র এক আগন্তুককে দেখে হোটেলওয়াল জু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো,—কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, আজ রাতের মতো আপনার হোটেলে থাকার ও খাবার মতো ব্যবস্থা হবে? আগন্তুক জানতে চায়।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় হোটেলওয়াল। বলে,—হঁ। ট্যাকে কিছু আছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হবে বৈকি, তা হবে, নইলে কি আর এমনি-এমনি এসছি—আগন্তুকটি পকেট থেকে একটি চামড়ার খণ্ডি বের করে টাকা দেখায়। আগন্তুকটিকে হোটেলওয়াল বলে,—আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল কথা, ওই ওখানে টুলটায় বসো, রান্না এখনো শেষ হয়নি।

আগন্তুকটিও যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়। দরোজার পাশে টুলটা টেনে বসে হাতের লাঠির উপর খুতখুত ভর দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে,—খাবার তৈরি হতে কি বেশি দেরি হবে তাই?

—না না, বেশি দেরি হবে না। একটু অপেক্ষা করো বাপু। হোটেলওয়াল জবাব দেয়।

তারপর হোটেলওয়াল পুরোনো একটি খবরের কাগজের পাশ থেকে সাদা একটিলতে কাগজ ছিড়ে পেন্সিল দিয়ে কি যেন লিখল। লেখা শেষ হলে হোটেলের একটি বেয়ারার হাতে কাগজটি দিয়ে হোটেলওয়াল তাকে ফিস-ফিস করে কি যেন বলে। বেয়ারা সেই কাগজ নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর বেয়ারাটি ফিরে আসে। হোটেলওয়ালার হাতে সে ছোট্ট একটি চিরকুট এগিয়ে দেয়, চিরকুটটি পাঠ করে হোটেলওয়ালার চোখমুখ কুঁচকে ওঠে। আগন্তুকটি কোণের টুলে বসে তখন চুলছে, সেদিকে এগিয়ে যায় হোটেলওয়াল, আগন্তুকটির পা ধরে সে নাড়া দেয়, ধড়মড় করে আগন্তুকটি তন্ত্রার যোর থেকে জেগে উঠে।

হোটেলওয়াল বলে,—কিহে! বসে-বসে ঘুমোচ্ছে নাকি? উঠ, কথা আছে।

আগন্তুকটি বলে,—খাবার তৈরি হয়ে গেছে? এই আসছি।

—শোন। খাবার তুমি পাবে না। কঠিন কঠে বলে হোটেলওয়াল।

—খাবার পাব না! কেন? কি হয়েছে? আমি কি পয়সা দেবো না নাকি?

—না, সে জানো নয়। পয়সা দিলেও আমি তোমাকে খাবার দিচ্ছি না।

—কেন? আমি কি অন্যায় করেছি? আগন্তুকটি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘরের এককোণে টেবিলের উপর সাজানো ছিল সার-সার পাত্র, সেদিকে এগিয়ে যায় সে, পাত্রের ঢাকনাগুলো উঠিয়ে ফেলে। সে কিছুকণে জিজ্ঞেস করে,—এই এতগুলো খাবার দিয়ে তুমি কি করবে? এগুলো কার জন্যে? আমি কোনো খাবার পাবনা?

হোটেলওয়াল বলে,—তুমি ছাড়া আরো লোক রয়েছে, আর তা ছাড়া খাবার থাকলেও আমি তোমাকে দিতে পারবো না।

এবার আকুলভাবে প্রার্থনা জানায় আগন্তুক, বলে—দেখুন, আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত, আমি আজ প্রায় বার মাইল পথ হেঁটেছি। সারাদিন কিছু খাইনি। খাবার না দিন, আপনার আন্তাবলের কোণে আজকের রাতে থাকবার মতো একটু জায়গা দিন। বাইরে দারুণ শীত। এখানে আমি কাউকে চিনি না। এই রাতে কোথায় যাব। আপনি ভেবেছেন, আমার টাকা নেই? আমি না হয় আপনাকে আগাম টাকাই দেবো।

হোটেলওয়াল এবার বলে,—দেখো বাপু, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি লোকটি নেহারেং ভালো মানুষ। ওসব কামেলা পছন্দ করি না। প্রথমই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ফাঁড়িতে খবর নিয়ে জানলাম, আমার অনুমানই সত্যি। বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি, তুমি সেই দাগী আসামী জাঁ ভালজা নও?

আগন্তুকের মুখ কল্পন হয়ে উঠে, মাথা নেড়ে সে জবাব দেয়,—হ্যাঁ, আমি জাঁ ভালজা।

—বস। ল্যাঠা চুকে পেল। দাপী আসামীদের আমি হোটেল জায়গা দিই না। যাও।

হোটেল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো ভালজা। কি যেন ভাবলো সে খানিকক্ষণ, তারপর আবার পথ চলতে শুরু করলো। তার পা যে আর চলে না।

চলতে-চলতে পথের ধারে ছোট একটি হোটেল গিয়ে উঠলো ভালজা। সে হোটেলের তার জায়গা হলো না। তারাও তাকে ভাঙিয়ে দিল। আবার সেই পথ। রাস্তা পরিশ্রান্ত হয়ে সে শহরের কারাগারের কাছে এসে দাঁড়ালো। কারাগারের প্রকাণ্ড ফটকের গায়ে একটি লোহার শেকল লাগানো। জোরে-জোরে শেকলটা টানতে লাগলো ভালজা। ফটকের ওপাশে শেকলের ও মাথায় বাধা ফাঁদ ঠন-ঠন করে শব্দ হলো।

ফাঁদের শব্দ শুনে কারাগারের এক রক্ষী বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার! শেকল টেনেছে কেন?

—আজ্ঞে, আমার নাম জাঁ ভালজা। দাপী আসামী। খুবই অসহায় অবস্থায় পড়েছি, থাকা-খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আপনাদের কারাগারে আজ রাতের জন্যে আমাকে একটু জায়গা দিবেন?

অবাক হয়ে রক্ষীটি ভালজার দিকে তাকিয়ে রইলো। লোকটি পাগল নাকি?

সে বললো,—যাও এখান থেকে, পাগল কোথাকার, কারাগার তোমার স্বপ্নব্যাধি নাকি, যে ইচ্ছে হলেই থাকতে পারবে। থাকবার সখ হয় তো যাও—গিয়ে একটা চুরি-ভাকতি করো। বলে রক্ষীটি চলে গেল।

আবার সেই পথ চলা শুরু হলো ভালজার। এই গলি সেই গলি চলতে লাগলো সে। পথের দু'পাশে কি সুন্দর সাজানো বাগান। দু'পাশে সুন্দর ছোট-বড় হিম-জাম বগুনগীর মতো বাড়ি।

এমন একটি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো ভালজা। একতলা সে বাড়ি। ছবির মতো। সাজানো ফুলের বাগান। জানালায় দামী পর্দা। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে কথাবার্তা। জানালার পর্দা একপাশে ঝটানো। ভালজা দেখতে পেল, একজন শ্রোতৃ ভদ্রলোক এক শিশুকে আদর করছেন। পাশে এক যুবতী গল্প করছেন। শিশুটি তার কচি-কচি হাত-পা নেড়ে খিল-খিল করে হাসছে। মহিলার কোলেও একটি শিশু। সেও মেন মিট-মিট হাসছে। ভালজা ভাবলো, শ্রোতৃ লোকটি নিশ্চয়ই ছেলেটির বাবা আর মহিলা মা। এত সুখ এত আনন্দ যেখানে, সেখানে নিশ্চয়ই তার মতো হতভাগ্যের আশ্রয় মিলবেও মিলতে পারে। দোরগোড়ায় এগিয়ে যায় ভালজা। খট-খট করে কড়া নাড়ে।

—কে? তেতর থেকে রাশভারী এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—আমি একজন অসহায়, দয়া করে দরোজাটা খুলুন।

দরোজা খুলে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন,—কি ব্যাপার, আপনি কোথেকে এসেছেন?

—আমি একজন বিদেশী আগন্তুক। আজকে ১২ মাইল পথ হেঁটে এই শহরে এসে পৌঁছেছি, খুবই ক্লান্ত। তাছাড়া বাইরে দারুণ বরফ পড়ছে। আমাকে আজকে রাতের জন্য একটু আশ্রয় দিন। এজন্যে আপনাকে যদি টাকা-পয়সা দিতে হয় আমি তাও দেব।

ভালজার আপাদমস্তক জরিপ করে ভদ্রলোক কৌতূহলের সুরে বলেন,—কোন হোটেল গিয়েছেন না কেন? পরসাই যখন খরচ করবেন, তখন...

—স্থানীয় কোন হোটলেই জায়গা পেলাম না। ভালজা জবাব দেয়।

—কোন হোটলেই জায়গা পেলেন না? বলেন কি! ওই যে কি নাম ওই আন্তাবলওয়ালা বড় হোটেলটায় গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে খেতে দিল না। আশ্রয় চাইলাম, তারা তাতেও রাজী হলো না।

লোকটির মনে এবার পুরোপুরিভাবে সন্দেহ জেগে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করেন,—দেবে না কেন? আপনার পরিচয় কি? কোথেকে এসেছেন?

হাতের হারিক্যান ভালজার মুখের কাছে তুলে ধরে কুণ্ঠিত চোখে তাকালেন ভদ্রলোক।

ভালজা ততক্ষণ দোরগোড়ায় বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ চুপ থেকে সে বললো,—ভীষণ ক্ষুধার্ত আমি। দয়া করে আমায় কিছু খেতে দিন। আমি আপনার কাছে সব খুলে বলবো। আমার বুক জ্বালা করছে। আমার হাত-পা কাঁপছে। আমাকে একটু দয়া করুন।

টেনে-টেনে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন ভদ্রলোক,—রোস বাবা, রোস—তোমায় ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, অনেক দিন আগে এক রাজকীয় প্রচার পত্রে তোমার ছবি দেখেছিলাম। তুমিই সেই জাঁ ভালজা?

ভালজা লোকটির পা জড়িয়ে ধরতে চাইলো। ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেয়ালে লটকানো বন্দুকটি টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ভালজার দিকে বন্দুক উঠিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—খবরদার বলছি, আর এক পাও এগিয়ে না। গুলী মেরে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো বদমাশ কোথাকার!

ভদ্রলোকের হাঁক-ডাক শুনে ভদ্রমহিলাও ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বাচ্চা দুটোও আর্তনাদ করে উঠলো, মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল। ভালজা তখনো বলে চলেছে,—আমাকে দয়া করুন হজুর। কিছু অন্ততঃ খেতে দিন। আমি আর সইতে পারছি না। আমায় এক গ্লাস পানি খাওয়াবেন? আমার কণ্ঠ নালী শুকিয়ে আসছে।

—পানি খাওয়াবো না ছাই! বন্দুক উঠিয়ে হুকুম দিয়ে ওঠেন ভদ্রলোক।—যাও বলছি এখান থেকে।

ক্লান্ত পায়ে টলতে-টলতে বেরিয়ে যায় ভালজা। দরোজা এঁটে দেন ভদ্রলোক। জানালাগুলোর পর্দা পর্যন্ত এঁটে দেন তিনি।

ধীর পায়ে এগুচ্ছে ভালজা। শীতের হাওয়া বইছে হু-হু করে। খানিক দূর এগিয়ে ভালজা। পথের পাশে একটি ছোট তেরপল ঢাকা জায়গা দেখতে পেল। রাজা মেরামতের কাজ হয়েছে ওখানে দিনের বেলায়। জায়গাটির এপাশে-ওপাশে ইট-সুরকী-বালি ছড়ানো।

মনে-মনে খুশি হয় ভালজা। তেরপলের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যায়। খানিকটা খড়ও বিছানো রয়েছে। খোলাটা নামিয়ে রাখে। তারপর ধীরে-ধীরে সে তার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করে। আর অমনি ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে আসে বড় একটি বাঘা কুকুর। কুকুরটি গর্তের এক পাশে বড়ের গাদার শুয়ে আশ্রয় করছিল—ভালজার অস্বাভাবিক প্রবেশে সে বিরক্ত হয়ে ওঠেছে হয়তো।

সামান্য একটা পথের কুকুরও তাকে দয়া করলো না! দুর্বল হাতে একবার লাঠি উঠিয়ে তেড়ে গিয়েছিল ভালজা। কিন্তু কুকুরটি তাকে কামড়াতে আসে। ভয়ে বেরিয়ে আসে ভালজা।

পথ চলতে-চলতে সে শহরের বাইরে চলে এলো। শীতের হিমেল হাওয়ায় যেন হাত-পা জমে যাচ্ছে। শহরের বাইরে খোলামেলা জায়গায় এসে হিমেল হাওয়ার কাঁপনে অস্থির অবস্থা তার।

ঘুরতে-ঘুরতে সে একটি গীর্জা দেখতে পেল। গীর্জার আশে-পাশে ছোট-ছোট কয়েকটি বাড়ি। আকাশ থেকে তাঁদের আলো ছড়িয়ে রয়েছে। ফিকে আলোয় একটি বাড়ির সামনে একটি পাথরের বেদী দেখতে পেলো সে। সেই বেদীর উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো ভালজা। কয়েক মিনিট হয়তো পেরিয়ে গেছে। ক্লান্তির অবসাদে সে তখন ঘুমে অচেতন।

দূর থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলো,—তুমি কে হে, ওখানটায় শুয়ে আছো ?

ধীরে-ধীরে তন্দ্রায় ঘোর কেটে যায়। ভালজা চোখ মেলে তাকায়। তারপর উঠে বসে। তার চোখে ভীত চকিত দৃষ্টি।

গলায় স্বরটি এবার বেদীর কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে,—এই শীতের রাজিতে তুমি কে হে বাপু, এখানে এমনি করে শুয়ে রয়েছ ? দারুণ শীত। তুমি জমে যাবে যে ?

সে দেখলো এক বুড়ী তাকে বলছে একথা। মেজাজ বিগড়ে গেল তার। বিরক্ত হয়ে বললো,—দেখতেই পাচ্ছে শুয়ে রয়েছি। তুমিও কি এখান থেকে আমার বাড়িরে দিতে এসেছো ?

বুড়ী অবাক হলো! সে মৃদু হাসলো। বললো,—হ্যাঁগো ভাল মানুষের ছেলে, আমি কি খারাপ কথা বলেছি ? রাগ করছো কেন ? বলছিলাম, এই দারুণ শীতের মধ্যে এই পাথরের উপর খোলামেলা জায়গায় শুয়ে থাকতে পারবে ?

—সে আমি বুঝবো, শুভে পারি কি না পারি। উনিশ বছর বত কষ্ট সহ্য করে চলেছি। কাঠের বেষ্টিতে এই উনিশ বছরে বছর আমাকে রাতের শয্যা করে নিতে হয়েছে। যাও বুড়ী মা, নিজের কাজে যাও। এই শীতে আমার কিছুই হবে না।

বুড়ী তখন বললো,—বুঝছি, তুমি সৈনিক। যুদ্ধ কর তাই না ? ভালজা জবাব দেয় না। বুড়ী আবার বলে,—তা বাবা, কোন হোটেলে গেলেই পার ? শহরে মেলা হোটেল রয়েছে। তা, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি বুঝি কিছু নেই ?

বুড়ী আঁচলের খুঁট থেকে কয়েক আনা পয়সা বের করে বলে,—আমার কাছে এই অল্প কয়েকটি পয়সা আছে। এর সাথে আর কিছু যোগার হলেই তোমার হোটেলের পয়সা হয়ে যাবে। নেবে এই পয়সা ?

—দাও—জাঁ ভালজা হাত বাড়ায় এবং পয়সাটা নেয়।

—কি করবো, আমি গরীব মানুষ। সাথে আর পয়সা নেই। হলে ভালো হতো। কোন হোটেল জায়গা মিলবে কিনা কে জানে। তবু যাও, চেষ্টা করে দেখগে। বললো বুড়ী।

—বুড়ী মা ! আমি সব হোটেলই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে কেউ জায়গা দেয়নি। আমার নাম জাঁ ভালজা শুনেই তাড়িয়ে দিলো। পয়সা দেবার কথাও বলেছিল। কিন্তু তবু একটু খাবার, রাতের একটু আশ্রয় পেলাম না কোথাও।

—এ কেমন কথা! এতো আর কক্ষনো শুনিনি। তা বাবা সব জায়গায় নাকি গিয়েছো—ওখানে গেছো ? গীর্জার পাশের বাড়িটি দেখিয়ে দেয় বুড়ী।

—না মা, ওখানে যাইনি তো!

—তবে ওখানেই যাও। খুব ভাল মানুষ থাকেন ওখানে। তোমার থাকা-খাওয়ার জায়গা মিলবে হয়তো।

বুড়ী 'ডি' শহরের বিশপ-এর ঘরটি দেখিয়ে দিয়েছিল। বিশপ মিরিয়েল-এর ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ভালজা। দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলো ভালজা, তারপর দরোজায় টোকা দিল—ঠক্-ঠক্ করে।

রাত তখন প্রায় আটটা। রাতের খাবারের সময় হয়ে এসেছে। বিশপ খাবার টেবিলে বসে তার বোনের সাথে আলাপ করেছিলেন। বাড়ির বুড়ী ঝি টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে। এমনি সময় দরোজার শব্দ হলো ঠক্ ঠক্ করে।

—ভেতরে আসুন—বিশপ বলেন।

দরোজা খুলে গেলো। ভালজা ঘরে ঢুকলো। বুড়ী ঝি আগন্তুককে দেখে পিছু হটে আসলো। বিশপের বোন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আগন্তুকের বেশভূষা আর ধরণ-ধারণ দেখে বিশপ কম অবাক হননি। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগে ভালজাই বলতে শুরু করলো,—আমার নাম জাঁ ভালজা। আমি একজন দাণী আসামী-কয়েদী। উনিশ বছর আমি জেল খেটেছি। কিন্তু আমিও আর সবার মতো একটি মানুষ। আমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে। মাথা গুঁজবার মতো ঠাই-এর দরকার রয়েছে। চার দিন হলো জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। তারপর থেকে আমার স্বস্তি নেই। সমাজের চোখে আজ আমি অবহেলার বস্তু। পোড় খাওয়া কুকুরের মতো এই চারদিন আমি এখান থেকে সেখানে ছুটে বেড়াছি। বার-তের মাইল পথ হেঁটে আজ আমি এ শহরে এসেছি। কিন্তু কোন হোটেল জায়গা পেলাম না, কোথাও কিছু খেতে পেলাম না। কোথাও জায়গা পেলাম না। পয়সা আমি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে পয়সা নিয়েও আশ্রয়

দিতে চায় না। সবথান থেকে আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। তারপর আপনার বাড়ির সামনের বেড়ির উপর এসে শুয়েছিলাম। একটু আগে এক বুড়ী আপনার বাড়িটি দেখিয়ে দিলো।

—দেখিয়ে দিয়ে ভালোই করেছে।

কি'কে বিশপ বললেন,—টেবিলে আরো একজনের জন্যে পেট, কাঁটা-চামচ সাজাও। আজকে আমাদের সাথে এই নতুন অতিথিও আহা করবেন।

ভালজী হতবাক। তার সাথে তো আবার তামাশা করা হচ্ছে না! কি আরেক গ্রন্থ পেট, কাঁটা-চামচ আনার জন্যে আলমারীর দিকে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললো। ভালজী,—দাঁড়াও।

তারপর বিশপকে বললো,—দেখুন, আমি সত্যি খুব সাংঘাতিক লোক। কয়েদী। উনিশ বছর জেল খেটেছি। চারবার জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করেছি। এই দেখুন, আমার ছাড়পত্র। ভালজী তার কোলা থেকে একটি হলুদ কাগজ বের করে দেখালো।

তারপর বিশপকে বললো,—এবার বলুন, ঠিক করে বলুন—আপনি আমাকে খাবার দেবেন, না তাড়িয়ে দেবেন?

—আপনি ক্লান্ত। চুলোর পাশে ঐ চেয়ারটায় বসে পা গরম করে নিন। বাইরে দারুণ শীত পড়েছে। বললেন বিশপ।

কি'কে বিশপ বললেন,—বুঝলে, আমাদের খেতে দিয়ে তুমি মেহমানের বিছানাটা ঠিক করে দিও।

কি টেবিলে আরেক গ্রন্থ কাঁটা-চামচ রেখে গেলো। বিশপ ভালজীকে বললেন,—আজকে দারুণ শীত, তাই না? ঘরে আগনের পাশে বসে রয়েছি, তবু মনে হচ্ছে, হাত বুঝি সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁক হয়ে যাচ্ছে।

বিশপ বললেন,—একি! আপনি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন! আর বসুনতো, জামা-কাপড় বদলাবেন না?

না, না, আর তো অবিশ্বাস নয়। তাহলে সে সত্যি-সত্যি খেতে পাচ্ছে। শোবার জায়গা পাচ্ছে। ভালজী বিশপের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।—আপনি বড় দয়ালু। আপনি কে বলুন?

—আমি এই গীর্জার বিশপ। কিন্তু ওকি হচ্ছে! আপনি আমাকে অযথা লজ্জা দিচ্ছেন। উঠুন দেখি। এটা আমার কর্তব্য। আপনি কয়েদী ছিলেন, উনিশ বছর জেল খেটেছেন, তাতে কি হল? আপনিও তো মানুষ? চলুন, চুলোর কাছটায় বসা যাক।

ভালজী বিশপকে বললো,—দয়া করে আমাকে আর আপনি বলে ডাকবেন না। আমি পাণী-তাপী মানুষ। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি এখন আর কোন অনুতাপ অনুভব করছি না। সবাই আমাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে দারুণ কষ্ট ভোগ করে চলেছি। বিধবা বোনের সাতটি ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্যে একটুকরো রুটি যোগাড় করতে গিয়ে উনিশ বছর কয়েদ-খাটলাম। আমার চাইতে একটা জানোয়ারের জীবনও ঢের ভাল। আপনি অনেক দয়ালু বিশপ,—বসতে-বলতে টেবিলের উপর মাথা ঝুঁজি ভালজী ফুঁপিয়ে কেন্দে উঠলো।

বিশপ ভালজীর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন,—শান্ত হও। এত বিচলিত হয়ে পড়ছে কেন? ইশ্বরকে শ্রদ্ধা করো।

টেবিলে ভাল আলো হচ্ছে না বলে কি অন্য ঘর থেকে রূপার দু'টো বাড়িদান এনে তাতে মোম জ্বালিয়ে রেখে গেল।

বিশপ বললেন,—এসো ভাই, শুরু করা যাক আমাদের খাবার।

অনেকদিন পর পরম ভৃগুর সাথে খাওয়া শেষ করলো ভালজী। এবার একটু ঘুম। বড্ড ক্লান্ত সে। দু'চোখে তার নেমে আসছে ঘুম।

ভালজীর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে বিশপের ঘরের ঠিক পাশের ঘরে। আসলে এটা একটি প্রার্থনা ঘর। ঘরের এককোণে পর্বর দেওয়াল দেয়া একটি কামরা। সেই ঘরটি দেয়া হলো ভালজীকে। ঘরের একপাশে ছোট একটা খাট। তার উপর ধবধবে বিছানা। খাটের কোণে একটা টেবিল। টেবিলের উপর রূপার বাড়িদানে বাতি। ঘরে ঢুকে ভালজী চারিদিকে অবাক চোখে তাকতে লাগলো। এতো সুন্দর একটা ঘরে তাকে ঘুমতে দেয়া হয়েছে!

বিশপও ভালজীর সাথে এ-ঘরে এনেছিলেন। ভালজীকে তিনি বললেন,—ভোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! ভূমি বড্ড ক্লান্ত। ভোমাকে এবার বিশ্রাম নিতে হবে। এবার শুয়ে পড়ো।

বিশপ তাঁর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। তারপর হঠাৎ থেমে আবার ভালজীকে বললেন,—আর হ্যা, শোন, কাল ভোরে এখান থেকে যাবার আগে কিছু না খেয়ে চলে যেও না.....। টটিকা দুধ থাকবে ঘরে। আমার নিজের গাছি গরম রয়েছে।

রাত তখন দুটো। গীর্জার ঘড়িতে চং-চং করে ঘন্টা বাজতেই ধড়মড় করে ভালজী বিছানার ওপর উঠে বসলো। বিছানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভালজী চারদিকে তাকতে লাগলো। ঘুমোবার আগে সে বাতিটি নিভিয়ে রেখেছিল। বাইরে হালকা জ্যোৎস্না। নরম আলো ওপাশের জানালা দিয়ে আসছে। ঘরে আর কোন আলো নেই।

চার ঘন্টা মাত্র ঘুমিয়েছে ভালজী। তার মনে হলো আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে বেশ হয়। এতদিনের ক্লান্তি অবসাদ পুরোপুরি সে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ঘুম হলো না ভালজীর।

পাশেই বিশপের শোবার ঘর। ভালজীর মনে পড়লো—ঘরের ভেতর দিয়ে আসবার সময় সে দেখেছে বিশপের কি রূপার খালা, বানন, কাঁটা-চামচ আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখছে। আছে আরো অনেক কিছু।

চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো ভালজীর। আবছা আঁধারে ঘরের সবখানেই সে যেন রূপার থানা-বানন, কাঁটা-চামচ দেখতে পাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারী করতে লাগলো ভালজী। ঘরের মধ্যখানে কপাট। কপাট খোলাই রয়েছে। ভালজী আস্তে-আস্তে ঠেলতে লাগল। তারপর আবার ফিরে এসে কোণের জানালার কাছে এগিয়ে গেল সে। গলা-সমান উঁচু জানালা, গরাদ দেই। ওপাশেই বাগান ঘিরে দেয়াল। তাও বেশি উঁচু নয়। ভালজী ভাবলো, দেয়াল টপকাতে অবশ্যি তেমন অসুবিধা হবে না।

ঘন-ঘন শ্বাস পড়ছে ভালজীর। দারুণ শীতেও কপালে কিছু ঘাম জমেছে। ভালো-মন্দ, দ্বিধা-ভয়, সন্দেহ-সংঘাতে ভালজীর মন দো-দোলায়মান। ভালজী তার ঝোলার মধ্যে থেকে লম্বা স্ট্রাচো একটা লোহা বের করলো। দেখতে অনেকটা সিঁদকাঠির মতো। জানালার কাছে গিয়ে আলোতে লোহাটা পরীক্ষা করে নিলো ভালজী। হ্যাঁ, এটা দিয়েই তালা খোলা যেতে পারে।

পায়ের জুতাজোড়া খুলে ঝোলার মধ্যে রাখলো ভালজী। হাতের লাঠিটি রাখলো জানালার কাছে, ঝোলাটা আর একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর সে পা টিপে-টিপে বিশপের ঘরের দিকে এগোতে লাগলো।

ভালজী ধীরে-ধীরে দরজার কপাটটা একটুখানি ঠেলে দিল। সামান্য পরিমাণ জায়গা ফাঁক হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে ঘরে ঢোকা অসম্ভব। আবার অতি সন্তর্পণে কপাটটা ঠেলেতে লাগলো ভালজী। কপাটের ফাঁক দিয়ে বিশপের বিছানাটা দেখা যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে কপাটের ফাঁক দিয়ে ভালজী বিশপকে দেখতে লাগলো। চাঁদের আলোয় মায়াময় মনে হলো বিশপকে। শান্ত, সৌম্য মুখ। দরোজা সোজাসুজি বিশপের পায়ের কাছে রাখা আলমারিতে সেই রূপার বাসনগুলি রয়েছে। ভালজীর চোখদুটো জ্বল-জ্বল করে উঠলো। কপাটের ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢুকতে গেল ভালজী। কপাটে মড়মড় করে শব্দ উঠলো। ভালজী ভয়ে একেবারে কাঁপে গেল। বুকটা হাপরের মতো উঠা-নামা করছে। নিশ্চল হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। কপাটের মরচে পড়া কজার তীক্ষ্ণ শব্দেই সবাই বুঝি জেগে উঠেছে। এই বুঝি সবাই 'চোর চোর' বলে তাকে তাড়া করে ধরে ফেলবে। কিন্তু না ঠিক তেমনি নিশ্চিন্ততা বিরাজ করছে, এক মিনিট, দু মিনিট... মিনিট পাঁচেক চলে গেলো। চারদিক সব নিব্বুম, ঘরের মধ্যে আধোজ্যোছনার আলো। বিশপ গভীর ধূমে অচেতন।

ভালজী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। ভালজী চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে নিল। তারপর বাসন-কোসন রাখবার আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। লোহার শিকের দরকার হলো না। আলমারির তালার সাথে চাবিটি লাগানোই ছিল। আলমারির পান্না দুটো খুলে ফেললো ভালজী। একপাশে তাক করে রূপার বাসন-কোসনগুলো সাজানো রয়েছে।

অনেক দুঃখ সয়েছে ভালজী। দুঃখ-কষ্টে তার জীবন ভারাক্রান্ত। জেল থেকে বেরোনের পর সারা পৃথিবীর উপরেই ভালজীর মনে একটা ক্ষোভ জমে গিয়েছিল। প্রতি পদে ঠোঁকর খেতে-খেতে তার সে ক্ষোভ আরো গভীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে ভালজী এও চেয়েছিল, সে বেঁচে থাকবে। নিষ্পাপ, নির্বিকার, শান্ত-সুন্দর একটি জীবনের সে অধিকারী হবে। অনুতাপ করার মতো কোন কাজ সে করেছিল বলে মনেও করেনি। তার বোনের কথা, তার বোনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের কথা সে কখনো ভুলতে পারেনি। অতীতের এই কয়েকটি বছর তার চোখের ঘুমকে কেড়ে নিয়েছে। তবু ভালজীর কোমল আর কঠোর গড়া মনে কেন জানি না অনুতাপ, না হিংসা, না ক্রোধ, না হতাশার এক শূন্যতা তাকে মাঝে-মাঝে পেয়ে বসে।

বাসন-কোসনের আলমারির উপরেই যীতর একটা ছবি। হাত বাড়িয়ে ছবিটি যেন কী বলতে চাচ্ছে। জ্যোছনার অস্পষ্ট আলোতে ছবিটি দেখে ভালজী চমকে উঠলো। বিশপ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। ভালজীর মনে হলো, ছবিটি বিশপকে আশীর্বাদ করছে। আবার মনে হলো, না না, ছবিটি ভালজীকে তিরস্কার করছে। ভালজীর মনে হলো, তার চারপাশে যেন কোন অশরীরী আত্মারা কথা বলে বেড়াচ্ছে—যে তোমাকে খাবার দিল, আশ্রয় দিল—তুমি তারই সর্বনাশ করছো ভালজী!

আবার সেই চিন্তায় পেয়ে বসলো ভালজীকে। তার চারপাশের পৃথিবী যেন টলছে; বিশপকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সে কি তার পা ধরে ক্ষমা চাইবে? খানিকক্ষণ কেটে গেল। ভালজীর বুকের ঝড় শান্ত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে কী ভালো কে জানে? হঠাৎ ভালজী তার থলিটা খুলে ফেললো। বাসন-কোসনগুলোকে পাজা করে সে থলির মধ্যে পুরে নিল। তারপর ঘরের বাইরে এসে তার শোয়ার ঘরের জানালা টপকিয়ে, বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে সে চলে গেল বাইরে।

পরদিন ভোর হতেই বিশপের বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ব্যাপারটা প্রথমে নজরে পড়ে বিশপের ঝি'র চোখে।

বুড়ী ঝি বিশপকে বললো,—হুজুর! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কালকেই বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটি সুবিধের নয়! বুনে ডাকাত-ডাকাত ডাব।

বিশপ তার বসবার ঘরে পায়চারি করছিলেন। বুড়ী ঝি'র কাছে সব কথা শুনে তিনি বললেন,—আমাদের খাবারের জন্য কাঠের বাসন-কোসন, দস্তার কাঁচা-চামচেই চলবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশপ আবার বললেন,—আহা বেচারী। এমন না করলেই চলত। বড্ড গরীব বেচারী, ভীষণ গরীব। বুঝলে বুড়ী মা, টাকা-পয়সা—তারপর এই ধরো গিয়ে এই যে সব দামী জিনিস-পত্র—এগুলো তো সব গরীবেরই। যারা খেতে পায় না তারা এসব পেলে কী ভালো হয় বলো তো। বিক্রি করলেও দুটো পয়সা হবে। ভালই হলো বুড়ী মা—ওধু-ওধু এতদিন এগুলো আমাদের কাছে ছিল। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের এসবের কী দরকার?—ভালই হোল।

বিশপের বোনও এর মধ্যে বিশপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশপের কথা শুনে তিনি আর কিছু বলতে ভরসা পেলেন না।

বিশপ বুড়ী ঝি আর বোনকে বললেন,—কিছু বলবে?

বোন আর বুড়ী ঝি কোন জবাব দিল না। তারা চলে গেল। এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো বিশপের মুখে। প্রসন্ন সে হাসি।

ভালজী কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেনি। পাঁচিল টপকিয়ে দুমদাম করে ছুটে পালাচ্ছিল ভালজী। রাত তখন সাড়ে তিনটা। পাহারাদার পুলিশের টোঁকি দেয়া তখনও শেষ হয়নি। ভালজী একদল পাহারাদার পুলিশের সামনে পড়ে গেল। নাক পর্যন্ত রান্না টুপি দিয়ে ঢাকা বোচকাসহ একটা লোককে পালিয়ে যেতে দেখে তাদের সন্দেহ হলো। ভালজী পুলিশের হাতে ধরা পড়লো।

ভালজাঁ জামালো, জিনিসগুলো তার চুরি করা নয়। বড় গীর্জার পদীসাহেব এগুলো তাকে দিয়েছেন।

পুলিশ বললো,—তাই সই। চল বিশপের কাছে। ভালজাঁকে নিয়ে পাহারাদার পুলিশরা এসে হাজির হলো বিশপের বাড়ি।

বিশপ ভালজাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন,—ভোরবেলা কিছু না বেয়েই চলে গেলে তুমি! তোমার জন্যে আমি বুড়ীকে কালরাতেই বলে রেখেছিলাম। খুব ভোরেই তোমাকে যেন এক গ্লাস গরম দুধ দেয়া হয়। অথচ কোথায় সাতসকালে উঠে কাউকে না বলেই তুমি চলে গেছো। আর হ্যাঁ, তোমাকে কালকে বাসন-কোসনের সাথে দুটো রূপোর বাতিদানও তো দিয়েছিলাম। সে-দুটো তুমি বোধহয় ভুলে রেখে গেছো। নিয়ে যাওনি কেন? নিয়ে যেও।

ভালজাঁ তখন মাথা নিচু করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী জবাব দেবে সে! বিশপ তাকে কেন বললেন না। কেন তাকে ধরে নৈশে প্রহার করলেন না। তা'হলেই তো ঠিক শাস্তি হতো। ভালজাঁ অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচে যেত।

পুলিশের দারোগা বিশপকে বললেন,—আজ্ঞা, তাহলে সত্যি-সত্যি ওগুলো আপনি ওকে দিয়েছেন? আমরা তো ভাবছিলাম চুরি—ছিঃ ছিঃ খুব অন্যায় হয়ে পেল। দারোগা ভালজাঁর হাতকড়া খুলে দিতে বললেন।

ভালজাঁর চোখে দপ করে যেন কী এক আলোর দীপ্তি দেখা গেল। সে তাহলে পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেল! তার আর জেল হবে না। কিন্তু তারপরেই সে আবার চুপসে গেল। মান হয়ে উঠলো তার দু'চোখের দীপ্তি। তার পায়ের কাছে থলিটি পড়ে রয়েছে। থলির মধ্যে রূপার বাসনগুলো রয়েছে। অন্ততঃ আট ন'শো টাকা দাম হবে এগুলোর। ভালজাঁর এবার মনে হলো সে অন্যায় করেছে। দীর্ঘ উনিশ বছরের কারাবাসের পর তার মনের মধ্যে জমে উঠেছিল ক্ষোভ আর ক্রোধের আগুন। এবার তার যেন অনুভূতি হলো। কারণ, ভালজাঁর মন তখনো নানা ভাবের আনাগোনায়ে দুলছে। এক দিকে পৃথিবীর প্রতি চরম ঘৃণা, অপরদিকে অন্যায় বোধ। ভালজাঁর সে সময়ের মনের অবস্থা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তার সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

দারোগা, পুলিশ চলে গেল! বিশপ ভালজাঁকে বললেন,—জাঁ ভালজাঁ! তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি ওঘর থেকে তোমার রূপার বাতিদান দু'টো নিয়ে আসছি। দেখো, এবারও না নিয়ে চলে যেও না যেন।

বিশপ খানিক পরেই রূপার বাতিদান দু'টো নিয়ে এলেন। ভালজাঁকে বললেন,—এই নাও এ দুটো বিক্রি করলেও তুমি কম করে একশ টাকা পাবে, নাও। লজ্জা করো না জাঁ ভালজাঁ। আমি কিছু মনে করিনি। প্রভু যীশু তোমার কৃপা করুন। তুমি এখন থেকে পরম প্রভু সৃষ্টিকর্তার সুন্দর সন্তান ভালজাঁ, তুমি ভাল হয়ে থাকবে। ভাল হয়ে বেঁচে থাকবে। আর হ্যাঁ, যদি কোনদিন এ শহরে আবার আস তাহলে আমার বাড়িতে এসো। কোন লজ্জা করো না। তুমি আমার খিয় ভাই হয়ে থাকবে ভালজাঁ। তুমি ভাল হয়ে থেকো।

বিশপ ভালজাঁর মাথায় হাত বুলাতে-বুলাতে কী এক আবেশে চোখ মুদে ফেললেন। দু'ফোঁটা অশ্রু টপ-টপ করে বারে পড়লো।

বিশপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ভালজাঁ। সাথে তার সেই থলির মধ্যে রূপার বাসন-কোসন। ভালজাঁ ছুটে পালাতে চায়। অস্বস্তির দারুণ দহনে সে ছুটফুট করছে। খোলা স্থান চাই। শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে—যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না—এমনি কোন জায়গায় ছুটে গিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ভালজাঁর। ভালজাঁর মনে নানা ভাবনার ঝড় বয়ে চলেছে।

সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ালো ভালজাঁ। তখন বিকেল। ভালজাঁ ঘুরতে-ঘুরতে হাজির হলো শহরের এক কোণে একটা মাঠে। বিরাট বড়, তেপান্তরের মত একটি মাঠ। মাঠের ওপারে নতুন বসতি, নতুন লোকালয়। 'ডি' শহরের সাথে ওপাশের লোকালয়ের যোগাযোগ সাধন করেছে এই মাঠটি।

ভালজাঁ সারাদিন ঘুরে-ঘুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনের মধ্যে তার সেই ঝড় এখনও থেকে গেছে কিনা কে জানে।

ভালজাঁ মাঠের মধ্যে একটি চিবির মতো জায়গা বেছে নিয়ে তার পাশে বসে পড়লো। বসে-বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। এমনি করে কতক্ষণ সে চুপ করে বসেছিল তা তার মনে নেই। হঠাৎ একটি সঙ্গীতের শব্দ ঘোর কেটে গেলো ভালজাঁর। কান পেতে ভালজাঁ গানটি শুনবার চেষ্টা করলো। শব্দটি ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। খানিক পর ভালজাঁ দেখতে পেল, এগারো বারো বছরের একটি ছেলে গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে। খুব হাসিখুশী ভাব। ছেলেটির পিঠে একটি বাস্ক খুলান, যাতে বেহালায় মত একটি যন্ত্র।

ভালজাঁ সে চিবির কাছে বসেছিল, ওটার পাশেই একটি ছোট খোপ। ছেলেটি গান গাইতে-গাইতে এসে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে খোপের ওপাশে বসে পড়ল। ভালজাঁকে সে দেখতে পায়নি। তখন পড়ন্ত বিকেল।

হঠাৎ কি জানি বেয়াল হলো ছেলেটির। পিঠের ছোট বাস্কটি সে খুলে ফেললো। বাস্কের মধ্যে আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলিতে মিলে কয়েকটি খুচরা টাকা। পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো ছেলেটি। তারপর তার মধ্য থেকে একটি চক্চকে আধুলি বের করে নিয়ে আবার বাস্কটা বন্ধ করে রাখলো। তারপর শুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে আধুলিটাকে হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টোকা মেরে শূন্যে ছুঁড়ে ছেলেটি খেলা করতে লাগলো।

ভালজাঁ খোপের আড়াল থেকে এসব লক্ষ্য করছে। সে কি ভাবছে কে জানে! কিন্তু আস্তে-আস্তে তার কপালের বলিরেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। চোখের দু'কোণ গেল বুঁচকে। ভালজাঁর চোখে যেন ক্রমশ বন্য দৃষ্টি।

আধুলিটি নিয়ে খেলা করতে-করতে একবার আধুলিটি ছেলেটির হাত থেকে ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। পড়েই গড়িয়ে-গড়িয়ে ঠিক ভালজাঁর পায়ের কাছে এসে আধুলিটি থেমে গেল। ভালজাঁ চট করে পা দিয়ে আধুলিটি চেপে রাখলো।

আধুলিটি হাত থেকে ফস্কে যেতেই ছেলেটি চটপট উঠে দাঁড়িয়েছে। আধুলিটি কোথায় গেল, তা তার নজর এড়ায়নি। সে সটান ভালজাঁর কাছে এসে হাজির হল। ভালজাঁ সব টের পেয়ে গেল। কিন্তু সে নির্বিকার বসে রইলো—যেন কিছু টের পায়নি। ছেলেটি কতক্ষণ উসখুস করলো। তারপর এসে একেবারে ভালজাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালো। এবার আর চোখ না তুলে উপায় কি?

ভালজাঁ কটমট করে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো,—কি চাস তুই?

—আমার আধুলিটি। ছেলেটি বললো।

—আধুলি! কিসের আধুলি রে? ভালজাঁ এবার বেশ রেগে জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটি ভাবাচাকা খেয়ে গেছে। লোকটি এমন খুনে দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে কেন? না, তবুও সে তার আধুলি না নিয়ে যাবে না। সারা দিন এখানে-সেখানে ঘুরে গান গাইতে তার কি কম কষ্ট হয়! সেখান থেকেই এই রুজি তার।

ছেলেটি মাঠের এদিক-সেদিক তাকালো। ধারে কাছে কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে-ক্রমে চারধার আঁধার হয়ে আসছে।

ছেলেটি ভালজাঁর আরেকটু কাছে সরে এলো। বললো,—ও সাহেব, দিন না আমার আধুলিটা। এতো আপনি পা দিয়ে চেপে রেখেছেন। দয়া করে আপনার পা একটু তুলুন! সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

এবার ছেলেটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ভালজাঁ। শেষ বিকেলের ছায়া পড়েছে তার চোখে। একদৃষ্টিতে সে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলো। ছেলেটিকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে চলে গেছে। জু কঁচকে এসেছে ভালজাঁর! ধীরে-ধীরে তার চোখে বুনো আক্রোশ জমা হতে লাগলো। দু'চোখে যেন কেমন চুরমার করে দেয়া দৃষ্টি। আবার মাঝে-মাঝে তাতে ফুটে উঠেছে কেমন অসহায় ভাব।

ছেলেটি ভালজাঁর বুনো চাউনি দেখে ভয় পেলে গেল। খানিকটা সরে দাঁড়ালো সে। ভালজাঁ জিজ্ঞেস করলো,—কি নাম তোর?

—আমার নাম জেয়োভে। আমার আধুলিটি দিয়ে দিন না সাহেব। আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। হুই শহরের সেই কোণায়—ছেলেটির কণ্ঠ ভেজা! সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

ভালজাঁ খপ করে জেয়োভের হাত চেপে ধরলো। আতঁনাদ করে উঠলো জেয়োভে। হঠাৎ কি ভেবে হাত ছেড়ে দিল ভালজাঁ। জেয়োভে ততক্ষণে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ ফুলে-ফুলে কাঁদার পর সে আবার বললো,—সাব! আপনার পা তুলুন না। আপনার পায়ে পড়ি আমার আধুলিটা দিন।

ভালজাঁ এবারও কটমট করে তার দিকে তাকালো। তারপর এক হুকুর ছেড়ে বললো,—ভাগ এখান থেকে।

জেয়োভে খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ভালজাঁর দিকে। তারপর অভ্যস্ত জোরের সাথে সে বললো,—আমার পরসাদ দিবে কিনা বলো? পা সরাও বলছি। পরসাদ দাও!

ভালজাঁ এবার বেকিয়ে উঠলো,—ভাগ বলছি এখন থেকে স্বরামজাদা।

এবার জেয়োভে সত্যি-সত্যি সরে এলো। খোপের ওপাশ থেকে সে তার কাঠের বাক্সটি নিয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেলো ভালজাঁর সামনে দিয়ে মাঠের ওপাশে।

সন্ধ্যা তখন রাতের মাঝে মিশে যাচ্ছে। কাক জ্যোছনা। শীতের বাতাস বইছে। জেয়োভে চলে যাবার পর কতক্ষণ ভালজাঁ ওখানে বসে ছিল তার মনে নেই। শীতের হাওয়া তার নাকে মুখে হ-হ করে লাগতেই সে উঠে দাঁড়ালো। ধীরে-ধীরে সে তার ডান পা ওঠালো। আধুলিটি মাটির সাথে সাপটে রয়েছে। জেয়োভের মুখটি তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো। এক দৃষ্টিতে আধুলিটার দিকে তাকিয়ে রইলো ভালজাঁ। তারপর এক সময় হ-হ করে কঁদে দিলো। সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো,—জেয়োভে! ও জেয়োভে! তুমি কোথায়। এসো তোমার জিনিস নিয়ে যাও।

কেউ সারা দিল না সে ডাকে। জেয়োভে সে পথ ধরে চলে গিয়েছিল সে দিকে হাঁটতে লাগলো ভালজাঁ। মাঝে-মাঝে জেয়োভের নাম ধরে চিৎকার দিয়ে সে ডাকতে লাগলো। মাঝে-মাঝে সে থেমে এদিক-ওদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। দূর থেকে কোন জিনিসকে দেখে সে ছুটে গেল জেয়োভে মনে করে।

ঘোড়ার চড়ে একজন বিশপ যাচ্ছিলেন সে পথে। ভালজাঁকে দেখে তিনি তাঁর গতি মন্থর করলেন।

ভালজাঁ বিশপকে কিছু বললেন না,—আমি ভালজাঁ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বিশপ ভাবলেন, লোকটা বুদ্ধি পাগল। তিনি আবার এগোতে লাগলেন।

এবার ভালজাঁ বিশপের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো,—একটু আমার কথা শুনুন। আচ্ছা এদিক দিয়ে ন'দশ বছরের একটি ছেলেকে যেতে দেখেছেন?

—ন'দশ বছরের ছেলে! কি নাম তার?

—হ্যাঁ, ন'দশ বছরের ছেলে! বেশ সুন্দর দেখতে। হাতে একটি কাঠের বাক্স ও বেহালা রয়েছে। তার নাম জেয়োভে। দেখেছেন তাকে?

—না ভো. মনে পড়ছে না! বোধহয় সে এই এলাকার নয়। বিশপ বললেন।

—অনুগ্রহ করে একটু মনে করে দেখুন। আচ্ছা! সে বোধহয় কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছিল।

বিশপ বললো,—না। এরকম কাউকে দেখিনি। ঘোড়া তখন ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভালজাঁও সাথে-সাথে এগোচ্ছে।

ভালজাঁ পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে বিশপের হাতে দিয়ে বললো,—গরীবদের দেবেন বিশপ। আর আমার কথা বলবেন। বিশপ আমি কিছু বলতে পারছি না, কিছু বোঝাতেও পারছি না।

বিশপ অবাক হলেন। বললেন,—টাকা!

—হ্যাঁ হ্যাঁ বিশপ, আমাকে একটু দয়া করুন,—পকেট থেকে আরো দুটো টাকা বের করে বিশপকে দিয়ে বললো ভালজাঁ,—নিম্ন, গরীবদের দেবেন।

ভালজাঁ এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। সে তখন বলছে,—আমায় গ্রেফতার করুন বিশপ। আমি খুনে, ডাকাতি, চোর, বদমাশ—আমাকে গ্রেফতার করুন।

বিশপ কোন জবাব দিল না। ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসিয়ে তিনি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। পিছু-পিছু ছুটে গিয়ে হেঁচট খেয়ে ভালজাঁ মুখ খুবড়ে পড়লো একেবারে।

খানিক পর উঠে দাঁড়ালো ভালজাঁ। একটু দূরে তার বাসন-কোসনের ধলেটা পড়ে রয়েছে। থলিটি হাতে নিয়ে সে টলতে-টলতে পথ চলতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে সে একটা তে-মাথার কাছে পৌছলো। মোলাটে দৃষ্টিতে সে তিনটি পথের দিকে তাকাতে লাগলো, সে কোন পথে যাবে? ক্লান্তিতে সারা শরীর যেন জড়িয়ে রয়েছে। তে-মাথার কাছে একটি পাথরের উপর বসে পড়লো জাঁ ভালজাঁ।

খানিক পর আবার সে হাঁটতে শুরু করলো। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্য নানা ভাবনায় তখন তার মনে ঝড় বয়ে চলেছে। বিশপের কথা মনে হলো—ভূমি এবার থেকে সংপথে চলবে ভালজাঁ। প্রভু যীশু তোমার মঙ্গল করুন। ভালজাঁ ভাবছিলো—সে কি ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে? সাথে-সাথে তার মনে জাগলো জিঘাংসা। আবার হঠাৎ করে জেরোভের কথা মনে হলো। পাপ-পুণ্যের দোদুল দোলার আন্দোলিত একটি ঝড়ের পাখির মতো ভালজাঁ পথ চলতে লাগলো। হঠাৎ ভালজাঁ দেখতে পেল—দূর থেকে যেন দুটো মশাল তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে মনে হলো—সে দুটো মশালের একটি হলেন বিশপ, আরেকটি সে নিজে। ধীরে-ধীরে একটি মশাল হারিয়ে গেলো আর আরেকটি মশাল যেন তাকে পথ দেখাতে লাগলো। সে মশালটি বিশপ। ভালজাঁ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

ভালজাঁ কতক্ষণ কেঁদেছিল, তারপর সে কোথায় চলে গেলো তা জানা গেলো না অনেকদিন। তার জন্যে কোন খোঁজও সেদিন পড়েনি। উনিশ বছরের কয়েদ খাটা একটি লোক এ শহরের ক'জনই বা চেনে, যদিও বা চেনে, কেই-বা তার খবর নেবে! বিশপ ছাড়া সবাই তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভালজাঁ কোথায় গেল তা কেউ জানে না। তবে সেদিন রাত তিনটার সময় যখন সরকারি ডাকগাড়ি যাচ্ছিল, তখন কে একজন বিশপের বাড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করে কি জানি বলছিল। ডাক গাড়ির লোকজন তাকে দেখেছিল।

ফ্রান্সের একটি শহর এমসুরেম। নকল চুনির ব্যবসায়ের জন্য সে সময় সারা ইউরোপে শহরটির বেশ খ্যাতি ছিল।

১৮১৫ সালের শীতের এক রাত। শহরে সে রাতের দারুণ নোরগোল কারণ, শহরের টাউন হল আঙন লেগে গেছে। সেই আঙনের শিকার হয়েছে লোকজন। ছোটোছুটি আর চিৎকার আর আতর্নাদে সেই এলাকায় তখন যেন এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। জমায়েত লোকজনের মধ্যে একজন সেই আঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লোকটির সাজপোশাক শ্রমিকের মতো। পিঠে খোলা, হাতে লাঠি। আঙনের মধ্য থেকে লোকটি পুলিশের বড় কর্তার দু'ছেলেকে উদ্ধার করলেন। পরে জানা গেল—লোকটি এ শহরে নতুন এসেছে। তিনি এ শহরের বাসিন্দা নন। তার নাম ফাদার মাদলেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুলে পাক ধরেছে।

শহরে আগমনের সাথে সাথেই ফাদার মাদলেন শহরের বাসিন্দাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন। এমন একজন আত্মত্যাগী লোক সম্পর্কে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে তখন কোন প্রশ্নও দেখা দিল না। ফাদার মাদলেন সেই শহরে বসবাস শুরু করলেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে ইমিটেশন চুনির একটা কারবারও খুলে বসলেন।

দিনের পর দিন যায়। ফাদার মাদলেনেরও দিন বদল হচ্ছে। ফাদার মাদলেনের ছিল অপূর্ব কর্মশক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কারবারের অবস্থা পাল্টে ফেললেন। তিনি ইমিটেশন চুনি প্রভুত্বের উন্নততর এক রাসায়নিক প্রক্রিয়া বের করলেন। তাঁর কারখানার চুনি সবার উপরে টেকা দেয়া শুরু করলো। সাধারণ লোক তো দূর থাকে, পাকা জহুরীরও অনেক সময় তাক্ লেগে যেত—এ আসল চুনি, না নকল চুনি! দেখতে-দেখতে সবখানে তার কারখানার চুনির নাম ছড়িয়ে পড়লো। ফাদার মাদলেনের কারখানা দিন-দিন বড় হতে লাগলো, কারবার ফুলে ফেঁপে উঠলো। এর সাথে-সাথে ফাদার মাদলেন তাঁর চুনির দাম কমিয়ে দিলেন আর কারখানার কারিগরদের মজুরী নিলেন বাড়িয়ে। কারবার শুরু করবার বছর পাঁচেকের মধ্যে তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হলেন। নকল চুনির ব্যবসাটি তিনি প্রায় একচেটিয়া করে ফেললেন। সারা ইউরোপে তাঁর চুনির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

কতো টাকা পয়সার মালিক হলেন ভালজাঁ, কিন্তু একটুও দেমাগ নেই। সাদাসিধে চালচলন। চুলগুলো তাঁর সাদা হয়ে গেছে। চেহারা দেখতে খানিকটা শ্রমিকের মতো। গাভীরময় মুখমণ্ডল। কিন্তু যখন হাসেন, তখন প্রাণ খুলে হাসেন। লোকজনের সাথে তিনি বড় একটা মেশেন না। নীরবে কাজ করে যান। কোথাও বসে তিনি আসর জমায় না, তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে বলেও মনে হয় না। মাদলেন বাইরে বেড়াতে বেরোন। যখন পথ চলেন, তখন মনে হয় যেন কোন এক সুদূর অতীত চেতনাকে নিবন্ধন করে তিনি চলেছেন। তাঁকে দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয়—তিনি যেন পাথরে খোদাই এক দার্শনিকের প্রতিচ্ছায়া। সাধারণ মোটা কাপড়ের লম্বা কোট। তাতে গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো, মাথায় একটি মোটা টুপি—এই হলো তাঁর পোশাক। যখন বাইরে বেড়াতে বের হোন তখন হাতে থাকে বন্দুক। আড়ম্বর নেই, বিলাসিতা নেই, কোন কিছুই নেই। অতি সাধারণ ফাদার মাদলেনের জীবন-যাত্রা। তাঁর বিশ্রামের শয়নকক্ষটিও নিরানবরণ। শুধু দুটি সেকেন্ডে ধরনের রূপোর বাতিদান ছাড়া সে ঘরে আর তেমন আসবাব-পত্র নেই। কুলুঙ্গীতে বসানো রয়েছে সে দুটো বাতিদান। আরেকটি জিনিষ তাঁর বাড়িতে ছিল। তা হলো বইপত্রের একটি ছোটখাট সংগ্রহ। অবসর সময়ে আর সব কাজের পর তিনি বই পড়তে ভালবাসতেন। এ বয়সেও দেহে তাঁর যেন দৈত্যের মতো বল। লোকের উপকার হয় এ ধরনের কোন নগণ্য কাজ করতেও তাঁর দ্বিধা-সন্দেহ নেই। রাস্তা দিয়ে চলছেন ফাদার মাদলেন, দেখলেন কারো ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে মুখ খুবড়ে পড়ে গেছে। তিনি গিয়ে তুলে দিলেন। লম্বা পা ঝড় ছুটছে, কেউ সাহস করে পাগলো ঝড়কে ঠেকাতে সামনে এগোচ্ছে না, প্রাণভয়ে সবাই এখার-ওখার ছুটছেন। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ফাদার মাদলেন। তিনি ঝড়কে ঠেকালেন। বাগে নিলেন ঝড়ের শিং দুটো ধরে, তাকে প্রায় নিশ্চল করে ফেললেন। এ সময়ও তার দেহে এমন বল।

পথ চলছিলেন মাদলেন। এক জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। কি ব্যাপার ? গাড়ীর চাকা কাঁচা মাটির রাস্তায় কাঁদায় বসে গেছে। ফাদার মাদলেন সেই কাঁদার মধ্যে নেমে চাকা তুলে দিয়ে সাহায্য করলেন।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ফাদার মাদলেনের দারুণ ভক্ত। ফাদার মাদলেন বেড়াতে গেলে পকেট ভর্তি খুরচা পয়সা নিয়ে বেরুতেন। মাঝে-মাঝেই গ্রামের ভেতর বেড়াতে যেতেন তিনি। তাঁকে দেখলেই গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যেত। তাঁকে ঘিরে দাঁড়াতো ছেলেমেয়েরা। তাদের তিনি পয়সা দিতেন। গ্রামের লোকজনের কাছে কসলের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। এটা-ওটা উপদেশ দিতেন। দেখে শুনে মনে হতো, ফাদার মাদলেন বোধহয় এককালে একজন অভিজ্ঞ চাবী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন গ্রামে কাটিয়েছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেতো না। সবার খবরাখবর ফাদার মাদলেন নিতেন, কিন্তু কারো সাথে বড় বেশি মিশতেন না। শহরের ছেলেমেয়েরাও তাকে খুব ভালবাসতো। ফাদার মাদলেন লোক বড় ভাল, তিনি কত রকমের খেলা দেন, ছবি দেন, খাবার দেন, দেন চকোলেট।

আরেকটি কাজ করেন ফাদার মাদলেন। কিন্তু তা অনেকটা গোপনে। দু'হাত খুলে তিনি গরীবদের সাহায্য করেন। অবশ্যি একথাও লোকজনের কাছে চাপা পড়েছিল। ফাদার মাদলেন এগিয়ে এলেন। টাকা-পয়সা দিয়ে হাসপাতালটির কাজকর্ম আবার ভালভাবে চালু করলেন। হাসপাতালে আরো দশটি বিছানা বাড়ানো হলো। এই বাড়তি খরচও মাসে-মাসে ফাদার মাদলেন বহন করতে লাগলেন। শহরের যে অংশে তিনি বাস করতেন, সেখানে ভাল ইকুল ছিল না—নামমাত্র একটা ইকুল ছিল। কিন্তু তাও অত্যন্ত জীর্ণ, হতশ্রী অবস্থা। ফাদার মাদলেন ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য একটি ইকুল স্থাপন করলেন। দুটো নতুন সুন্দর দালান তিনি তৈরি করে দিলেন। শিক্ষকদের বেতন ছিল কম। তিনি তাদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন। বাড়তি টাকাটা দিলেন নিজের পকেট থেকে। তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু শ্রমিকদের সাহায্যের জন্যে একটি সমবায় তহবিল গঠন করলেন। শ্রমিকদের জন্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করলেন।

এত যে দান-ধ্যান করেন, এত যে টাকা-পয়সা, এ নিয়ে ফাদার মাদলেনের কোন রকম দত্ত নেই। নিজেকে জাহির করার সামান্য প্রচেষ্টাও তার রয়েছে বলে মনে হয় না। আর লোকজনের সেবা ? সেবাকে ফাদার মাদলেন জীবনের ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

শহরের সাধারণ লোকজনের এই প্রিয়জনটির জীবন এমনিভাবেই কেটে যাচ্ছিল। শহরের লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করে ডাকে মসিয়ে মাদলেন। কিন্তু শ্রমিক, কারিগর ও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ফাদার মাদলেন, প্রিয় মাদলেন। দানধ্যান করেন, শ্রমিক, কারিগরদের মঙ্গলের কথা এত চিন্তা করেন, তার উদ্দেশ্য কি ? এ নিয়ে কারো-কারো দারুণ মাথা ব্যথা শুরু হলো। মাদলেন যখন প্রথম কারবার শুরু করেছেন, কারবারের পেছনে অসম্ভব খাটছেন তখন এসব লোকজন বলতেন,— মাদলেন বড়লোক হতে চায়। কিন্তু যখন তারা দেখলেন মাদলেন নিজে বড়লোক হতে চায়। কিন্তু যখন তারা দেখলেন মাদলেন নিজে বড়লোক হওয়ার জন্য নয়—অন্যকে

সম্মল করে বড় করে তুলতে চাচ্ছেন, বিত্তহীনদের স্বজি-রোজগারের সুযোগ দিচ্ছেন, তিনি আসার পর শহরের শ্রমিক ও কারিগরদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে, কারবারে ঠিকমতো টিকে থাকার জন্যে ফাদার মাদলেনের দেখাদেখি অন্যান্য ব্যবসায়ীরা শ্রমিক ও কারিগরদের মজুরী কিছু না কিছু বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ফাদার মাদলেন আসার পর শহরটি আগের চেয়ে অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—তখন লোকজন বলা শুরু করলেন,—ফাদার মাদলেন খ্যাতির কাশাল, কারবার ভালো করে বাগিয়ে বসেছে। এখন একটু যশের প্রয়োজন, প্রতিপত্তির প্রয়োজন। ফাদার মাদলেন তাই চান।

ফাদার মাদলেন এ শহরের আসবার পর থেকে এক ভদ্রলোকের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। তিনি হলেন ঐ প্রদেশের সংসদের সদস্য। যারা একটু অপরিচিত একটু আধুটু সমাজহিতকর কাজ করতেন, তাদের সবাইকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সন্দেহ করতেন। ফাদার মাদলেনকে দেখে তিনি ভাবলেন লোকটি নির্ঘাত সংসদের সদস্য হতে চায়। তাই সদস্য ভদ্রলোকও আদাপানি খেয়ে লেগে গেলেন। শহরের হাসপাতালে তিনিও কিছু টাকা-পয়সা সাহায্য দিলেন। বাড়তি দুটো বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন। ধর্মের প্রতি সদস্য ভদ্রলোকের এমনিতে কোন আস্থা ছিল না। যারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতেন, তাদেরকে বরঞ্চ তিনি করুণার চোখে দেখতেন। এদিকে ফাদার মাদলেন প্রতি রোববার নিয়মিত গীর্জায় যান। বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে জীবন নির্বাহের চেষ্টা করেন। ভীষণ ডাবনায় পড়লেন সদস্য ভদ্রলোক। তারপর তিনি ভোল পাল্টে ফেললেন আর যাই হোন, নির্বাচনে মাদলেনকে হারাতেই হবে। তিনি দু'বেলা গীর্জায় বাওয়া শুরু করলেন।

দেখতে-দেখতে বছর চারেক কেটে গেল। ১৮১৯ সালের দিকে এমসুরেম শহরে এ-কান থেকে ও-কানে একটি খবর ছড়িয়ে পড়লো। কি বৃত্তান্ত ? না, রাজা নাকি স্থির করেছেন—ফাদার মাদলেনকে এমসুরেম শহরের মেয়র হিসাবে মনোনয়ন দেবেন।

ফাদার মাদলেনের ইচ্ছাটা কী, এ নিয়ে চিন্তায় যাদের খাদ্য মুখে উঠছিলো না, তারা এবার উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তারা বলাবলি শুরু করলেন—কি, আগেই তো বলেছিলাম যে, ঐ ফাদার মাদলেন একটু খ্যাতি আর প্রতিপত্তি চায়। এবার দেখলে তো!

শহরের লোকজন খবরটা কোথেকে পেয়েছিল জানি না, কিন্তু আসলে খবরটা একটা নিছক গুজবও ছিল না। সত্যি-সত্যি রাজা ফাদার মাদলেনকে মেয়র হিসাবে নিযুক্ত করলেন। সরকারি গেজেটে তার নাম ছাপা হলো।

কিন্তু ফাদার মাদলেন রাজার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন। যারা জল্পনা-কল্পনা করছিলেন, তাঁদের মুখে রা রইলোনা।

নকল চুনি প্রভুতের যে আধুনিক পদ্ধতি ফাদার মাদলেন আবিষ্কার করেছিলেন; সেবছর শিল্প প্রদর্শনীতে তা দেখানো হলো। চুনি বিশেষজ্ঞেরা পদ্ধতিটির প্রচুর প্রশংসা করলেন। ফাদার মাদলেনের এই কৃতিত্বের জন্যে রাজা তাকে বিশেষ উপাধি দান করলেন। মাদলেন এবারো জানালেন, রাজা মাদলেনকে খেতাব দিয়েছেন। শুনে সেই জল্পনাকারী লোকজন বলেন,—তাই বলা। মাদলেন গোপনে-গোপনে এই খেতাব

পাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মাদলেন যখন খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন তারা রীতিমত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ব্যাপার কি? ফাদার মাদলেনের ইচ্ছেটা তাহলে কি? কেউ-কেউ বলাবলি শুরু করলেন,—দেমাফ, শ্রেফ দেমাফ। মাদলেন এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

কেউ-কেউ বললেন,—ফাদার মাদলেন অত অল্পতে তুষ্ট নয়। শুধু মেয়র করলেই চলেবে না—মাদলেন ক্রশ চার ক্রশ, কিন্তু ফাদার মাদলেন যখন ক্রশ গ্রহণেও অসম্মতি জানালেন, তখন সবাই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মাদলেন তাহলে আসলে কি চান? লোকটা কি খেয়ালী?

এদিকে সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকজন ফাদার মাদলেনের দিকে বেশ খুঁকে পড়লেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসা শুরু করলো। একদিন যারা ফাদার মাদলেনকে দেখে নাক উঁচুভাব করতেন তাঁদেরই কেউ-কেউ এগিয়ে এলেন সখ্যতা করার জন্যে। ধনবান ফাদার মাদলেনের কারবারে দেশের বড়-বড় ধনীরা তাদের টাকা খটানোর আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ফাদার মাদলেন এসব আমন্ত্রণও গ্রহণ করলেন না। সখ্যতা করার জন্যে যারা হাত বাড়ালেন, তারা ফাদার মাদলেনের নাগাল পেলেন না। স্বার্থ হয়ে তারা সবাই বলাবলি শুরু করলেন,—কোথাকার না কোথাকার লোক এই মাদলেন! একবারেই পেরো! ভদ্রতা জানে না, বকলম, একটি বেনে—ইত্যাদি! এসব কথায় ফাদার মাদলেন অবশ্য কোন আমল দিতেন না।

দেশের রাজা কিন্তু ভুললেন না। পরের বছর অর্থাৎ ১৮২০ সালে তিনি আবার ফাদার মাদলেনকে এম্‌সুরেম শহরের মেয়র হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ফাদার মাদলেন এবারও রাজি হলেন না। কিন্তু রাজাও এবার এসব গনতে রাজি নন।

তিনি বললেন,—দেশের ও দেশের কল্যাণের জন্য ফাদার মাদলেনের আরো সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। উহু, কোনো কথা নয়। মঁসিয়ে মাদলেনকে অবশ্যই রাজি হতে হবে।

এদিকে ফাদার মাদলেনের কারখানা-বাড়ির সামনে এসে জনগণ ভিড় জমিয়ে দাবী জানানো শুরু করলো—ফাদার মাদলেনকে মেয়র হতেই হবে। দেশের বড়-বড় লোকেরা, সমাজের উঁচু বংশের লোকেরাও তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

একটি বুড়ী তার ঘরের জানালা থেকে টেঁচিয়ে বলল,—মঁসিয়ে মাদলেন, আপনি দয়া করে মেয়র পদ গ্রহণে সম্মত হন। আপনি কি জনসাধারণের মঙ্গল চান না? মেয়র যদি একজন সৎ, জ্ঞানবান ও কর্মনিষ্ঠ লোক হয়, তবে জনসাধারণের ভীষণ উপকার হয়, আমাদের সেই উপকার করার যোগ্যতা আপনার রয়েছে মঁসিয়ে মাদলেন। এতে অসম্মতি জানিয়ে আপনি আমাদের অপকার বা অপমান করতে পারবেন না।

এত লোকের অনুরোধকে উপেক্ষা করা গেল না। এম্‌সুরেম শহরের মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণে ফাদার মাদলেন শেষ অব্দি রাজী হলেন।

কিন্তু মেয়র হয়েও সেই আগের মতোই রয়ে গেলেন তিনি। মেয়রের কাজটুকু শেষ করে তিনি বাকী সময় একাকী থাকতে ভালবাসতেন, শুধু নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মনের উত্তাপ দিয়ে, কখনো নাম না জানা উদাস-করা নিঃসঙ্গতায়

হারিয়ে গিয়ে, বেদনার পোড়াজে-পোড়াজে তিনি সেসময় ব্যক্তিগত কিংবা জনকল্যাণকর নানা কাজে নিজেকে মগ্ন রাখতেন! এসব অনেক কাজেরই পুরো ইতিহাস অনেকেরই জানা ছিল না। মঁসিয়ে মাদলেন মাঝে-মাঝে বলতেন,—এ পৃথিবীতে কেউ খারাপ নয়, কোন কিছুই খারাপ নয়; আসলে সত্যি কথা বলতে কি—পারিপার্শ্বিকের জন্যে সবকিছু হয়।

মঁসিয়ে মাদলেনের আরেকটি অভ্যাসের কথা এখানে বলতে ভুলে গেছি। অল্প বয়সী ছেলেরা বিশেষ করে যারা গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে বেড়ায় কিংবা যারা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় ও চিমনি পরিষ্কার করে, তাদেরকে দেখতে পেলে মঁসিয়ে মাদলেন কাছে ডাকতেন। তাদের নাম-ধাম, এ-কথা নে-কথা জিজ্ঞেস করতেন। পরে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করতেন। কালক্রমে একথা বিভিন্ন শহরে জানাজানি হয়ে গেল। অনেক ছেলে টাকা-পয়সা পাবে এমন লোভে এম্‌সুরেম শহরে এসে মঁসিয়ে মাদলেনের নজরে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

মেয়র মাদলেনের যোগ্য পরিচালনায় এম্‌সুরেম শহরের দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সবার উপার্জন আগের চেয়ে বেড়ে গেল। সরকারের রাজস্ব আদায়ের অনুবিধা কমে গেল। রাজস্ব আদায়ে আগে যে টাকা খরচ হতো, তার চার ভাগের এক ভাগ খরচ কমে গেলো। রাজস্ব মন্ত্রী তাঁর রিপোর্টে একথার উল্লেখ করলেন।

১৮২১ সালে 'ডি' শহরের সেই বিশপ মিরিয়েল মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বোন তাকে দেখাওনা করতেন।

বিশপ মিরিয়েলের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল, মঁসিয়ে মাদলেন শোকচিহ্নরূপ কালা পোশাক পরিধান করেছেন।

শহরে এ নিয়ে আবার নতুন জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। অনেকেই ধারণা করলেন, বিশপ মিরিয়েল হলেন মঁসিয়ে মাদলেন-এর রক্ত স্পর্শকিত কোন নিকটজন। বিশপ মিরিয়েল ছিলেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধের ব্যক্তি। এবার মঁসিয়ে মাদলেনের উপর লোকজনের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। সমাজে উঁচু শ্রেণীর লোকদের তাঁকে নিজের লোক ভাবতে তখন আর তেমন দ্বিধা নেই। মঁসিয়ে মাদলেনও এটা বুঝতে পারলেন। তাঁর প্রতি সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোকজনের সৌজন্য, তাঁকে খ্রীতি সঙ্গ্রামের ঘটা দেখে অজ্ঞতঃ এট। না বোঝার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তবু একটা খটকা থেকে গেল।

বিশপের মৃত্যুর কয়েক দিন পর অভিজাত শ্রেণীর এক কৌতূহলী বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন,—মঁসিয়ে মাদলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? বিশপ মিরিয়েল কি আপনার কোন নিকট আত্মীয় ছিলেন?

মাদলেন জবাব দিলেন,—না।

—তবে আপনি তাঁর মৃত্যুতে শোকচিহ্ন ধারণ করেছেন কেন?

মাদলেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,—ছোটবেলায় আমি বিশপ মিরিয়েলের চাকর ছিলাম।

বৃদ্ধা খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন।

সময় গড়িয়ে যায়। বদল হয় মানুষের ধ্যান-ধারণা। সময়ের প্রবাহে অতীতের অনেক বিকল্পতা মানুষ ভুলে যায়। মানুষ তার ভুলও বুঝতে পারে। মঁসিয়ে মাদলেনের বেলায়ও তাই হলো। তাঁর উপর একশ্রেণীর লোকের যে বিকল্পভাবে ছিল, ক্রমে তা দূর হয়ে গেলো। তাঁকে নিয়ে আর জল্পনা-কল্পনা হয় না, নিন্দা, ঈর্ষা, কুৎসা সবকিছুই একদিন শেষ হলো। শহরের লোক আজ তাদের প্রিয় মেয়ের মঁসিয়ে মাদলেনকে আন্তরিক সম্মান করে। 'ডি' শহরের বিশপ মিরিয়েল সম্পর্কে জনসাধারণ যে ধারণা পোষণ করেন, মঁসিয়ে মাদলেন সম্পর্কেও সবার তেমনি উঁচু ধারণা। দূর-দূরান্ত এমনকি অন্য শহর থেকেও লোকজন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে। বিবাদ-বিসম্বাদ হলে আদালতে যাওয়ার আগে তাঁর কাছে বিচারের ভার দেয়। শহরে আসার মাত্র সাত বছরের মধ্যে নানা অভিজ্ঞতার উত্তরণে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৮২১ সালে মঁসিয়ে মাদলেন হয়ে গেলেন সে-শহরের জনগণের প্রিয় মাদলেন।

সারা দেশের লোক যাকে আপনজন হিসাবে ভাবছে, শ্রদ্ধা করছে, তাঁকে এমসুরেম শহরের অন্ততঃ একজন সহ্য করতে পারছিল না। মঁসিয়ে মাদলেনের প্রতি তার মনে রয়েছে সন্দেহের দোলা। সন্দেহটি তার মনে বলতে গেলে একটি খুঁটির মতো দাঁড়িয়েছে। মাদলেনের যে এত সুনাম, এত প্রতিপত্তি, এত আকর্ষণ রয়েছে তবুও কেন যেন তার মনের বিকল্প ভাবটি কাটেনি। মেয়ের মঁসিয়ে মাদলেন রাত্তি দিয়ে যখন হেঁটে চলতেন, তখন এই লোকটিকে মাঝে-মাঝে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যেত। কখনো-কখনো সে অনুসরণ করে চলতো মেয়ের মাদলেনকে। চট করে বোঝবার উপায় নেই যে, লোকটি মেয়ের মাদলেনের পিছু নিয়েছে, কিংবা তার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু কেউ যদি এদিকে ভালভাবে নজর দিতো তাহলে দেখতে পেতো, লোকটি যেন মেয়ের মাদলেনের পেছনে একেবারে আঁঠার মতো লেগে রয়েছে।

লোকটি দীর্ঘকায়, তার নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁটের উপর একজোড়া প্রকাণ্ড গোঁফ, মসোলীয়ান ধরনের বৃহৎ চোয়াল, ছোট মাথা, মাথার চূলে কপাল ঢাকা। তাকে দেখলেই লোকের মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার মুখের হাসি দেখা অতি বিরল ঘটনা। মনে হয় সব সময়ই সে বুকি রেগে রয়েছে। মুখের ভাবে রয়েছে আঁকিবুকি কুণ্ঠিত রেখা, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন একটু মিনমিনে; কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টি। লোকটি মাঝে-মাঝে যখন হাসে তার নাকের দু'পাশে চ্যাপ্টা দু'টো ভাঁজ পড়ে। নাকের গভীর ছিদ্র আরো ফেঁপে ওঠে। হাসলে তাকে দেখায় বাঘের মতো। মনে হয় লোকটি বোধহয় সব ধরনের নিষ্ঠুর কাজই করতে পারে। তার পরনে সর্বদা থাকে খাকি পোশাক। হাতে বেতের লাঠি; মাথায় টুপি। কপালের বেশ খানিকটা সেই টুপিতে ঢাকা থাকে। মাঝে-মাঝে তাকে গুচ্চরের মতো মনে হয়; কখনো মনে হয় শিকারী বাঘের মতো। মনে হয় অতর্কিতে কোন গুচ্ছান থেকে বুকি সে সামনে লাফিয়ে পড়বে। সাধারণ লোকের সাথে অবশ্য একটি ব্যাপারে তার মিল রয়েছে। আনন্দিত হলে সে নাকে নসি়া নিতে শুরু করে।

এই লোকটি হলো এমসুরেম পুলিশের ইন্সপেক্টর জাভেরর। আগে সে দক্ষিণ প্রদেশের কারাগারের কর্মে নিযুক্ত ছিল।

জাভেররের জন্ম হয় কারাগারে। তার বাবা ছিল কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। সে নৌকায় কাজ করতো। তার মা লোকের হাত গুণে ভাগ্য ফল বলতো। জাভেররের চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হলো—বিদ্রোহের প্রতি বিদ্বেষ এবং শাসকদের প্রতি আনুগত্য। তার ধারণা ছিল বিচারক কখনো অন্যায় করেন না; শাসনকর্তার কখনো ভুল হতে পারে না। তার ধারণা—যে অপরাধী, তার কাছ থেকে কোন গুড ফলের আশা করা যায় না; অপরাধীর কখনো দোষ স্বলন হবার নয়। শাসন-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত উর্ধতন প্রত্যেক লোকের প্রতি ছিল তার গভীর সম্মানবোধ। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ছিল তার চরম ঘৃণা, অবজ্ঞা আর বিদ্বেষ। আরেকটি কথা—নরহত্যা থেকে সাধারণ চৌর্যবৃত্তি পর্যন্ত সব অপরাধই ছিল জাভেররের কাছে বিদ্রোহের নামান্তর।

তবে একথাও ঠিক, তার চরিত্রে তেমন কোন দোষ ছিল না। অনেক পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে রুঢ়তা, ক্রুরতা, প্রভুত্ববোধ, নিচতা থাকে; তার খানিকটা ইন্সপেক্টর জাভেররের মধ্যেও ছিল। কিন্তু নিচমনা যাকে বলে সে তেমনটি ছিল না। আমোদ-প্রমোদে সে সময় নষ্ট করে না। কাজে তার কোন শিথিলতা নেই। বরঞ্চ বলা যায়, কর্তব্যের কাছে সে আত্মদান করেছিল। যে কাজে সে নিযুক্ত থাকতো সে কাজ শেষ করাই ছিল তার ধ্যান ধারণা। কর্তব্য করতে গিয়ে সে চারধারে রাখতো সজাগ দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই—আছে শুধু কর্তব্য আর কর্তব্য। প্রলোভন তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অপরাধীকে খুঁজে বের করা তার সাধনা; অপরাধ বড় সামান্যই হোক না কেন; জাভেররের চোখে তা' মারাত্মক, অপরাধীকে ধরার জন্যে সে চরম নির্মম। এমনকি তাঁর বাবা কিংবা তার মা কোন অন্যায় করলেও জাভেরর হয়তো নির্মমতার সাথে ধরিয়ে দিয়ে চরম ভুগ্টি পেতো।

এই জাভেররের দৃষ্টি পড়লো মঁসিয়ে মাদলেনের উপর। আগেই বলেছি—মঁসিয়ে মাদলেনের প্রতি ইন্সপেক্টর জাভেররের সন্দেহ একটি সংস্কারের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী যেভাবেই চলুক না কেন, বিভ্রাট যেমন ইদুরের অস্তিত্ব বুঝতে পারে, এ অনেকটা তেমনি। এ কথা ঠিক—মানুষের এ ধরনের সংস্কার অজান্তে নয়। তাহলে বুদ্ধি বৃত্তির চেয়ে সংস্কারই হতো উৎকৃষ্ট। কিন্তু সে যাই হোক—জাভেরর অন্ততঃ অনুভূতি কিংবা সংস্কারের বাশেই মঁসিয়ে মাদলেনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছিল। তার মনে জিজ্ঞাসা—এঁকে যেন কোথায় দেখছি? আমি কি প্রভাবিত হবো?

ইন্সপেক্টর জাভেরর যে তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখছে এ কথা মঁসিয়ে মাদলেনও বুঝতে পারলেন। জাভেরর যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেভাবে অনুসরণ করে, তা' মাঝে-মাঝে রীতিমত অভব্য ও অস্বস্তিকর। কিন্তু এতে মঁসিয়ে মাদলেনের কোন ভাবান্তর হলো না। তাঁর উদার চোখে এ জন্যে কোন মেঘ জমেছে বলেও বোঝা গেল না। তিনি তাঁর সেই আগের অভ্যাস মতোই চলাফেরা করতেন। জাভেররকে ভেবে তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন না, তার কাছে তিনি গেলেনও না কিংবা এড়িয়েও চললেন না। আর সবার সাথে তিনি যেভাবে চলেন, জাভেররের সাথেও তাঁর তেমনি সম্পর্ক।

জাভেরও মঁসিয়ে মাদলেনের এমনি ব্যবহারে খানিকটা চিন্তিত হলো। কিন্তু মঁসিয়ে মাদলেনও জাভেরের একদিনের আচরণে খানিকটা ভাবনায় পড়লেন।

এমসুরেম শহরে এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ছিল, তার নাম ফোশল্ভা। ফোশল্ভা বয়সে বৃদ্ধ। সে সামান্য লেখাপড়া জানতো। আগে সে অন্য ব্যবসায় করতো। কিন্তু তাতে সে তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ব্যবসায় ফেল পড়লো। নিরুপায় হয়ে সে ঘোড়ার গাড়ি চালানো শুরু করলো। মঁসিয়ে মাদলেনের প্রতি ফোশল্ভার একটি ঈর্ষাভাব ছিল। কারণটাও স্বাভাবিক। কোথাকার কোন মুল্লুক থেকে মাদলেন এই শহরে এসে সামান্য অবস্থা থেকে হু-হু করে কারবার জমিয়ে বসলো এবং বলতে গেলে সারা ব্যবসায় একচেটিয়া করে নিল আর ফোশল্ভা গেল দিন-দিন রসাতলে। ফোশল্ভা সুযোগ পেলে মঁসিয়ে মাদলেনের ক্ষতি করারও কসুর করবে না, এমনি ব্যাপার।

মাল বোঝাই গাড়ি নিয়ে ফোশল্ভা একদিন কাঁচামাটির রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় কাদা জমে গেছে। চলতে-চলতে একসময় রাস্তায় একপাশের থকথকে কাদার মধ্যে গাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ঘোড়াটিও মুখ খুঁড়ে কাদার মধ্যে পড়ে গেল। ফোশল্ভা গাড়ির চাকার নিচে সেই কাদার মধ্যে আটকে গেল।

দেখতে-দেখতে চারধারে লোক জমে গেল। সবাই হৈ-চৈ শুরু করে দিল। এ-বলে এ-কথা, ও-বলে সে-কথা। কিন্তু ফোশল্ভাকে বাঁচাবার তেমন কোন ব্যবস্থা কেউই করছে না। এর মধ্যে একজন শুধু গাড়ি ভোলার জ্যাক আনতে লোক পাঠাল। অনেক লোকই জমেছে মজা দেখার জন্যে।

মঁসিয়ে মাদলেন তখন ওপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভীড় দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। অবস্থা দেখে তিনি বললেন,—আপনারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছেন, এদিকে বুড়ো যে মারা যাচ্ছে! ইস্‌স, চাকা কেমন ধীরে-ধীরে কাদায় বসে যাচ্ছে। আচ্ছা ভাই, এখানে ধারে-কাছে কারো জ্যাক আছে?

—জ্যাক আনতে তো লোক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সে এখনো ফিরে আসেনি। বোধহয় আরো দশ পনেরো মিনিট লেগে যাবে ওর ফিরতে।—কে একজন জবাব দিল।

—কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই। দেখছেন না চাকা কেমন বসে যাচ্ছে! দশ-পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলে ফোশল্ভা মারা যাবে। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যিনি গাড়ির চাকার নিচে কাঁধ দিয়ে গাড়িটাকে একটু উঁচু করে তুলে ধরতে পারেন? আমি তাকে পনেরো টাকা দেবো। দেরি নয় ভাইসব! বলুন!—মাদলেন জিজ্ঞেস করলেন।

সমবেত লোকজনের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো, কিন্তু কেউ এ কাজে এগিয়ে এল না। মাদলেন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন,—ঠিক আছে, তিরিশ টাকা দেবো!

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বললো,—মঁসিয়ে, এজন্যে দানবের মতো শক্তি

দরকার। তাহাড়া, কাদার মধ্যে গাড়ির নিচে একজনের বেশি উপুড় হয়ে থাকার যায়গা নেই। সবাই মিলে গাড়িটা কি টেনে তোলা যাবে? কিন্তু তাও যে সম্ভব নয় মঁসিয়ে মাদলেন! আ-হা, বুড়ো বড় কষ্ট পাচ্ছে ঠিক!

—পারে! সারা ফরাসী মুল্লুকে বোধহয় একজনই এই কাদার মধ্যে ডুবে যাওয়া চাকাকে তুলতে পারে। কিন্তু সে এখন কোথায় কে জানে!—অপর একজন বলে উঠলো।

সবাই ভাকিয়ে দেখলো লোকটির দিকে। সে হলো ইস্পেট্টর জাভেরর। কখন যে সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, মঁসিয়ে মাদলেনও তা খেয়াল করেন নি।

জাভেরর বললো,—হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় সেই একজনেরই তেমন দানবের মতো শক্তি রয়েছে। সে ছিল তুলো জেলখানার একজন কয়েদী। এখন সে কোথায় আছে আমরা সঠিক জানি না।

মাদলেন একথায় জাভেররের দিকে ফিরে তাকালেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর দৃষ্টি আটকে রইলো জাভেররের ভাবলেশহীন মুখের মধ্যে। ফোশল্ভা এসময়ে আবার কাঁহুরে উঠলো,—উহু! আর কতক্ষণ! খুব লাগছে! মরে গেলান, আমাকে বাঁচাও!

ভীড়ের হৈ-চৈ বেড়ে গেলো। ইস্পেট্টর জাভেরর ভাকিয়ে রয়েছে মঁসিয়ে মাদলেনের দিকে। সময় তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। চারধারের লোকজনের দিকে তাকালেন মাদলেন! এক মুহূর্ত তিনি যেন কি ভাবলেন। তারপর গায়ের কোটটি খুলে ফেলে কেউ কিছু বুঝবার আগেই উপুড় হয়ে চলে গেলেন গাড়ির চাকার নিচে কাদার মধ্যে। লোকজন তখনো থম মেরে রয়েছে। মাদলেন ততক্ষণে গাড়ির চাকা তুলবার জন্যে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। ইস্পাডের মধ্যে সবল পেশীগুলো তাঁর ফুলে উঠেছে। কিন্তু না, চাকা উঠছে না। মঁসিয়ে মাদলেনের চোখে-মুখে যেন সারা দেহের রক্ত জমেছে, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বরছে। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর বৃদ্ধি পাবেন না। লোকজন হৈ-চৈ করে উঠলো,—আপনি বেরিয়ে আসুন ফদার মাদলেন। আপনি যে চাকার নিচে আটকা পড়ে যাচ্ছেন। নইলে আপনিও মারা পড়বেন।

যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে ফোশল্ভাও বললো,—আপনি বেরিয়ে যান মঁসিয়ে মাদলেন। মরলে আমি একাই মরবো।

মাদলেনের তখন কোন কথা বলার সময় নেই। মরণের সাথে তিনি যেন মুখোমুখি যুদ্ধ করছেন। এক সেকেন্ড থেকে দশ সেকেন্ড! হঠাৎ গাড়ির চাকা একটু নড়ে উঠলো। সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলো। ‘চাকা উঠেছে’। অতি আশ্চর্যে সবাই প্রতীক্ষা করছে। তারপর এক সময়ে দেখা গেল, গাড়ি উপরে উঠে গেছে! চাকা কাদার উপরে ঝুলছে। মাদলেন শান্ত স্বরে বললেন,—এবার আপনারা সাহায্য করুন ভাইসব! ফোশল্ভাকে চাকার তলা থেকে তুলে নিন।

মাদলেন ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ঘেমে তিনি নেয়ে উঠেছেন। সারা গায়ে কাদা। কাঁপড়-চোপড় ছেঁড়া। ফোশল্ভাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার আগে

ফোশল্ভা তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। সবাই মাদলেনকে ঘিরে জয়জয়কার করছে। শুধু একজনের চোখে যেন কেমনতর দৃষ্টি। সে হলো ইন্সপেক্টর জাভের।

পরদিন মসিয়ে মাদলেন কিছু টাকা পাঠালেন ফোশল্ভাকে। সাথে একটি চিঠিতে জানালেন ফোশল্ভার পাড়ি ভেঙ্গে গেছে। ঘোড়াটি মরেছে। ফোশল্ভার এখন টাকার খুব প্রয়োজন।

দিনকয়েকের মধ্যেই ফোশল্ভার অবস্থার উন্নতি হলো। কিন্তু দেখা গেল, সে বিকলাস হয়েছে। তার একটি পা পঙ্গু হয়ে গেছে। এবারও তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন মসিয়ে মাদলেন। ফোশল্ভা সুস্থ হয়ে ওঠার পর তিনি তাকে প্যারিসের স্যাথ আঁতোয়ান পল্লীর একটি আশ্রমে মালীর কাজ জুটিয়ে দিলেন।

পুরোটা শহরে মাদলেনের আত্মত্যাগী মনোভাবের কথা আবার আলোচিত হতে লাগলো। কিন্তু একজনের মনে তখন সন্দেহের মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে। মসিয়ে মাদলেনের ব্যাপারে সে এবার আরো উঠে পড়ে লাগলো। সে প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলো। শহরের সর্বজন প্রিয় মেয়রের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলা তার মতো একজন কর্মচারীর পক্ষে হবে ধূর্ততা এবং জঘন্য অপরাধ। তাই সে নিরবে মেয়রের আদেশ পালন করে যেতে লাগলো। এ হলো সেই পুলিশের ইন্সপেক্টর জাভের।

অবশেষে ইন্সপেক্টর জাভেরের চেষ্টা সফল হলো। এই চেষ্টা কতটা মহৎ তা হয়তো বিতর্কসাপেক্ষ, কিন্তু জাভেরের উদ্দেশ্য হাসিল হলো। আদ্যোপান্ত পরিচয় ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করে সে একদিন সময়ের এক নিষ্ঠুর ইতিহাস তুলে ধরলো। সে প্রমাণ করলো—সর্বজন শ্রদ্ধেয় মেয়র মাদলেন আর কেউ নন, ইনিই হলেন সেই দাগী কয়েদী জাঁ ভালজাঁ। আট বছর আগে একটি অল্পবয়স্ক ছেলের কাছ থেকে কিছু অর্থ জোরপূর্বক অপহরণ করেছিলেন বলে জেল খেটেছিলেন।

মসিয়ে মাদলেন ওরফে জাঁ ভালজাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তিনি পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি আবার ধরা পড়লেন। পালিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ বাহিনী তাঁকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল কিন্তু এতোদিন ধরা সম্ভব হয়নি।।

তখন-তখন করে তারা জাঁ ভালজাঁকে খুঁজছিল। পালিয়ে যাওয়ার দিন তিন-চারের পরের কথা। প্যারিস থেকে যে সব ছোট গাড়ি গ্রামের দিকে যায়, তার একটিতে উঠতে যাচ্ছিলেন জাঁ ভালজাঁ। এমন সময় তিনি ধরা পড়েন।

নকল চুনির ব্যবসারে জাঁ ভালজাঁ সদুপায়ে প্রায় কয়েক লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমিয়েছিলেন। একটি ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত ছিল। গ্রেফতারের পরে পলায়ন এবং পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার মাঝে তিন-চার দিনের মধ্যে তিনি কৌশলে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক উঠিয়ে নেন। এরপর টাকাটা তিনি কোথায় গচ্ছিত বা লুকিয়ে রেখেছেন, জানা গেল না। এ ব্যাপারে পুলিশকে তিনি একটি কথাও বললেন না, কাজেই টাকারও স্বত্বান মিললো না।

বিচারের জন্যে দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হলো জাঁ ভালজাঁকে। তাঁর অপরাধ—আট বছর আগে একটি ছোট ছেলের কাছ থেকে তিনি বলপূর্বক অর্থ অপহরণ করেছেন; গ্রেফতারের পর আইন অমান্য করে তিনি কারাগার থেকে পালিয়েছেন, তিনি দক্ষিণাঞ্চলে ডাকাতিদলেরই একজন ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁ ভালজাঁ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করলেন না। বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হলো। অবশ্য তাঁকে মৃত্যু থেকে রেহাই দিলেন। জাঁ ভালজাঁকে তুলো কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। ১৮২৩ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে জাঁ ভালজাঁর কাহিনী ফলাও করে ছাপা হলো।

কারাবাসে গেলেন সর্বজনপ্রিয় মসিয়ে মাদলেন; আগের জীবনে জাঁ ভালজাঁ অপরাধ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর হয়েছিল আমূল পরিবর্তন। তাঁর আগের অপরাধের পটভূমি কি কেউ বিচার করেছে? নতুন জীবনে মসিয়ে মাদলেনরূপী জাঁ ভালজাঁ সংপথে থেকে পরের সাহায্য সেবার জীবন উৎসর্গ করে দিন কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি রেহাই পেলেন না। পুরোনো অপরাধ ধাওয়া করে এল তার পিছু-পিছু।

জাঁ ভালজাঁ ওরফে মসিয়ে মাদলেন চলে যাওয়ার পর দেখতে-দেখতে এমসুরেম শহর শ্রীহীন হয়ে উঠলো। চুনির ব্যবসারে মন্দা দেখা দিলো। মালিক-শ্রমিকের মনকষাকষি শুরু হলো। জিনিসের মান খারাপ হলো। ঋদ্ধের আস্থা কমে আসতে লাগলো। বহু কারখানা বন্ধ হলো; বহু শ্রমিক বেকার হলো; উৎপাদন হ্রাস পেলো; ভালোবাসার বদলে দেখা দিলো বিদ্বেষ। প্রদেশের রাজস্ব আদায়ে শাসন কর্তৃপক্ষের বায় আবার বেড়ে গেলো। সব দেখে-শুনে একথা স্পষ্ট হলো—সমৃদ্ধির প্রাণপুরুষ ছিলেন মসিয়ে মাদলেন।

মাস তিনেক পরের কথা। সকাল বেলা। তুলো বন্দরে দারুণ হৈ-চৈ কাণ্ড। একটি জাহাজের খালসী মাঝুলে পাল খাটাতে গিয়ে মরণের মুখোমুখি হয়ে পড়লো। মাঝুলের একেবারে শেষ মাথায় খালসীটি দড়ি বাঁধছিল। হঠাৎ তার পা ফস্কে যায়। অতল সমুদ্রে খালসী পড়তে-পড়তে কোন রকমে একটি দড়ির নাগাল পেল। পালের একটি খুঁটির সাথে আর মাঝুলের মাচানের সাথে দড়িটি বাঁধা ছিল। শূন্যে দোল খেতে লাগলো খালসীটি। হাতের মুঠি একটু শিথিল হলে সে ভলিয়ে যাবে অতল সমুদ্রে। হয়তো-বা জাহাজের গায়ে লেগে যেতলে যাবে তার সমস্ত দেহ।

জাহাজঘাটে সমবেত লোকজন হৈ-চৈ করে উঠলো। জাহাজটি একটি পুরানো যুদ্ধ জাহাজ। সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে তুলো বন্দরে এসে আশ্রয় নেয়। ঝড়ে জাহাজটির দারুণ ক্ষতি হয়। তুলো বন্দরে এর মেরামতির ব্যবস্থা হচ্ছিল। নতুন কোন জাহাজ বন্দরে এলে এমনিতেই লোকজন ভীড় করে তারপর এটি আবার ঝড়ে পড়া জাহাজ। জাহাজঘাটে কৌতূহলী লোকের কমতি নেই।

কিন্তু তারা কেউ খালসীটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এলো না। সবাই শুধু হৈ-চৈ আর হায়-হায় করছিল। এদিকে আতঙ্কে খালসীটির চোখ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তার শরীর অবশ হয়ে আসছে। এমন সময় দেখা গেল মাঝুলের মাচানের উপর তরতর করে উঠে যাচ্ছে একটি লোক। পরণে তার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর পোশাক। নীল

টুপি, লাল জামা! জাহাজঘাটের লোকজন অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথার নীল টুপি উড়িয়ে গেল। লোকটির মাথার ধবধবে সাদা চুল।

কয়েক সেকেন্ড মাচানের উপর দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো সে। তারপর মাচানের সাথে একটি দড়ি বেশ শক্ত করে বেঁধে তা নিচে নামিয়ে দিল। আবার চারদিকে তাকিয়ে কি যেন সে দেখলো। তারপর দড়ি ধরে নিচে নামতে লাগলো।

এদিকে খালসীটির সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ততক্ষণে অবশ হয়ে আসছে। তারপর দুটি হাত ক্রমে-ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। এই বুঝি সে পড়ে যায়! রক্ত নিঃস্থাসে লোকজন তাকিয়ে রয়েছে কয়েদী আর খালসীটির দিকে।

আর বুঝি খালসীটি পারছে না। তার হাত শিথিল হয়ে গেলো। চারদিকে সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলো—গেল-গেল পড়ে গেল। চোখের পলক পড়েছে কি পড়েনি এর মধ্যেই কয়েদীটি একহাতে দড়ি নিয়ে আরেক হাতে খালসীটিকে বগল দাবা করে ধরে ফেললো। খালসীও তাকে আঁকড়ে ধরলো। খালসীটিকে নিয়ে সেই কয়েদী তখন দড়ি বেয়ে উপরে মাচানে উঠে এলো।

উল্লাস আর আনন্দধ্বনিতে ফেটে পড়লো লোকজন। তারা চিৎকার করে কয়েদীকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। কেউ-কেউ বললো,—এই কয়েদীকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু ওকি! কয়েদীটি অমন করছে কেন? মাচানের উপর সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ক্রান্তিতে সে সেই সুউচ্চ মাস্তুলের উপর টলে-টলে পড়ছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েদীটি মাথা ঘুরে সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেল। জাহাজটির পাশেই নোঙ্গর করা ছিল কয়েকটি জাহাজ। দু'জাহাজের মাঝখানে ঝুপ করে পড়ে গেল কয়েদীটি। লোকজন হৈ-হৈ করে উঠলো, একটু আগের আনন্দ উৎসব মিলিয়ে গেল কর্পরের মতো।

সাথে-সাথেই কয়েদীটির উদ্ধারের কাজ শুরু হলো। সারাদিন তার তল্লাশী চললো; কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

কয়েদীটি পাশের জাহাজেই আসছিল। খালসীর যখন জীবন-মরণ অবস্থা তখন সে জাহাজের কাণ্ডানের কাছে গিয়ে বললো,—আমাকে যদি সুযোগ দিন তাহলে আমি লোকটাকে বাঁচবার চেষ্টা করি।

কাণ্ডান কি এক কাজে তখন বুঝ ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঘড়ি নেড়ে সম্মতি জানালেন। কাণ্ডানের কেবিন থেকে দ্রুত গতিতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কয়েদীটি। একটি হাতুড়ি নিয়ে সারা গায়ের জোর দিয়ে আঘাত করতেই তার পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে গেল। সে সোটা একটি দড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল পাশের জাহাজে।

৯৪৩০ নম্বরের এই কয়েদী ছিলেন জাঁ ভালজাঁ। সংবাদ-পত্রে তাঁর অপমৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলো।

কিন্তু জাঁ ভালজাঁ মরেনি। ক্রান্তিতেও তিনি টলে পড়েননি। ইচ্ছে করেই তিনি এমনভাবে সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলেন। পায়ের লোহার বেড়ী আগেই তিনি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাই সাতরাতে আর কোন কষ্ট হয়নি। কাছেই একটা জাহাজ নোঙ্গর

করা ছিল। তার সাথে বাঁধা ছিল একটি নৌকা। এসব তিনি আগেই ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন। সমুদ্রে পড়ে তিনি ডুবসাঁতার দিয়ে জাহাজের সেই নৌকার পাশে গিয়ে উঠলেন। রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন, রাতের আঁধারে গিয়ে ডাঙায় উঠলেন।

কয়েকদিন পর প্যারিসের শহরতলির একটি বাড়িতে বসবাস করতে দেখা গেল জাঁ ভালজাঁকে। এধাকটি একটু নির্জন—বসতি তেমন ঘন নয়। লোক চলাচলও অপেক্ষাকৃত কম। দোতলা বাড়ি, নিচের তলায় ঘর ওলো ছোট-ছোট সঁয়ান্ত-সঁয়ান্তে; দোতলায় কয়েকটি ঘর ও কয়েকটি খুপরি। নিচের তলায় ঘরগুলোতে মজুর শ্রেণীর লোকজন থাকে। উপর তলায় লোকজনের সাথে নিচের তলার লোকজনের সম্পর্ক নেই। দোতলার একটি ঘর নিলেন জাঁ ভালজাঁ। ঘরটি দোতলার ঠিক মাঝামাঝি। ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। বাড়ির সামনে একটি মাঝারি ধরণের পার্ক। জানালা দিয়ে ভাও নজরে পড়ে।

জাঁ ভালজাঁর সাথে থাকে কোজেত। সাত আট বছর বয়স। পৃথিবীতে কোজেতের কেউ নেই। সে অনাথা। জাঁ ভালজাঁ যখন মঁসিয়ে মঁদলেন ছিলেন তখন থেকে চিন্তেন কোজেতকে। ওর মা বড় হতভাগিনী। মঁসিয়ে মঁদলেন বড় স্নেহ করতেন তাকে। কোজেত-এর মা মেয়েকে মঁসিয়ে মঁদলেনের হাতে ভুলে দিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। মৃত্যুর সময় মঁদলেন কথা দিয়েছিলেন,—আমি আজীবন ওর দেখাশোনা করবো। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো।

ভালজাঁ ঘর পেরস্থানীর কাজ করার জন্য এক বুড়ী ঝিকৈ নিয়োগ করলেন।

বুড়ী ঘরদোরের কাজ, রান্নাবান্না, জিনিসপত্র কেনাকাটার কাজ সব কিছু করে। ও বাড়ির দোতলারই একটি কুঠুরীতে বুড়ী থাকে। ঘরের ভাড়া তাকে দিতে হয় না। বাড়ির মালিকের হয়ে সে সবকিছুর খেয়াল রাখে। এজন্য তার একটু দাপটও আছে। বুড়ী কানে ভালো শুনতে পায় না। সারাদিন কাজে অকাজে সে বিড়-বিড় করে। সামনের দিকে দু'তিনটি দাঁত ছাড়া আর সব দাঁত তার পড়ে গেছে। বুড়ীর একটি দোষের কথা জাঁ ভালজাঁ জানতে পারেননি। সবার প্রতি বুড়ীর যেন কেমন একটা বিদ্বেষভাব, কেমন যেন একটা সন্দেহ ছিল। কাউকেই সে সুনজরে দেখতো না। বুড়ী কেবল বিড়-বিড় করতো আর আপন মনে কোন এক অজানা আক্কেশে মাঝে-মাঝে দাঁত কাটতো।

দিনের পর দিন চলে যায়। মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল জাঁ ভালজাঁর দিনও। বাড়ির বা বাইরের কারো সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ঘর ভাড়া নেবার আগে বাড়ির ঐ বুড়ী ঝিকৈ তিনি বলেছিলেন যে, কোম্পানীর কিছু কাগজ তাঁর কেনা আছে। তার সুদ থেকে যে সামান্য আয় হয় তা' থেকেই খাপ ও মেয়ের সংসারটি কোন মতে চলে। তবে ভয় নেই—ভাড়া ঠিক মতোই পাবে। আগাম ছ'মাসের ভাড়াও তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

চলারফেরা, খাওয়া-দাওয়া কোন বিলাশিতা, কোন আড়ম্বর নেই জাঁ ভালজাঁর। ঘরে কোন আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

দিনের বেলা কখনো বাইরে বের হন না জাঁ ভালজাঁ। সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য তিনি বেড়াতে বেরোন। কোনদিন একা, কোনদিন সাথে থাকে কোজেত। বাইরে বেড়াতে ছোট্ট কোজেত-এর ভারি উৎসাহ। সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকতে হয় বেচারীকে। বাইরে বোরোবার সময় সে ভালজাঁকে এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞেস করে দারুণ ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। রাতের বেলায় বেরোলেও বেশ ভয়ে-ভয়ে পথ চলেন জাঁ ভালজাঁ। যে রাস্তায় লোক চলাচল বেশি সে পথে তিনি চলেন না। যে পথে আলো বিশেষ নেই সেই পথ দিয়ে তিনি যান। প্রতিদিন এসময় তিনি গীর্জায় যান উপাসনার জন্যে। গীর্জাটি কাছেই। জাঁ ভালজাঁকে একজন সাধারণ শ্রেণীর লোক, একজন গরীব মজুর ছাড়া ভিন্ন কিছু ভাবার উপায় নেই। মাঝে-মাঝে বেশ মজা হয়। দয়ানন্দ লোক হয়তো তাকে হিসেবে তাঁর হাতে দুয়েকটা পয়সা গুঁজে দেয়। নীরবে সে দান গ্রহণ করেন ভালজাঁ। আবার কখনো এমন হয়—কোন ভিখারী তাঁর কাছে পয়সা চেয়ে বসে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে তখন ভালজাঁও ভিখারীকে দু'চার আনা ভিক্ষে দিয়ে দেন। ব্যাপারটি ক্রমে-ক্রমে কয়েক জনের চোখে পড়লো।

কোজেতকে কাছে পেয়ে ভালজাঁ জীবনের এক অনাবদিত দিককে খুঁজে পেলেন। ভোরে কোজেত তাঁর ঘুম ভাঙ্গায়। সারাদিন নানা কথায় খেলাধুলায় অভিমান আবাদারে সময়কে ভরিয়ে রাখে কোজেত। ভালজাঁকে সে ডাকে বাবা বলে। সেহময় বৃদ্ধ পিতা হিসাবেই ভালজাঁকে চিনেছে কোজেত।

বৃদ্ধ ভালজাঁর এতদিন পর আবার মনে হলো সত্যিকার অর্থে জীবনের এক বিশেষ সার্থকতা আছে। তিনি জীবনভর কয়েদ খেটে আর লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভাল হয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্য তাঁকে নিয়ে হিনিমিনি খেলছে। তার মনে সংস্কল্প স্থায়ী হয়ে বসার তেমন সুযোগ বা পরিবেশ পায়নি। তবু তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর বিগত জীবনের ক্রটি-বিচ্ছিন্ন সংশোধনের জন্য। তবু কেউ তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেনি। কিন্তু আজ ভালবাসা পেয়েছেন। অট বছরের এক বালিকা তাঁকে সেই ভালোবাসা দান করেছেন। কোজেত তাকে সারা মন উজাড় করে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। অজ্ঞ আর জাঁ ভালজাঁ মনে মনেও কাউকে দোষ দেন না। সকাশ থেকে সময় গড়িয়ে চলে আর সেসময় ভরিয়ে রাখে কোজেত গল্পে আর খেলাধুলায়। জাঁ ভালজাঁকে সে বাবা বলে ডাকে। ক্ষণ-ক্ষণে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাঁ ভালজাঁ তখন পরম ভৃত্তিতে অনুভব করেন তাকে বেচে থাকতে হবে। জাঁ ভালজাঁ কোজেতকে লেখা পড়া শেখানো শুরু করে দিলেন। কোজেত যখন পড়াশুনা করে তখন তাঁর চোখে ছায়া ফেলে উজ্জ্বল সোনালী দিন। কোজেত যখন আপন মনে খেলা করে তখন জাঁ ভালজাঁ তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু ভালজাঁর ভাগ্যে কি নিখাদ সুখ আছে। বাড়ির সেই হিংসুটে বৃত্তবৃত্তে দাঁত কিড়মিড় করা বুড়ী ঝি সত্যিই বুঝি গণ্ডগোল বাধালো। আগেই বলেছি, বুড়ী ঝি কাউকেই সুনজরে দেখতো না। সে ভালজাঁর পিছু লাগলো।

ভালজাঁ দিনের বেলা কখনো বাড়ির বের হন না; এতে বুড়ীর ভারী কৌতূহল হলো। চালচলনে ভালজাঁকে গরীব বলে মনে হলেও তিনি যে মাঝে-মাঝে ভিখারীদের দু'য়েক আনা ভিক্ষে দেন, একথাও বুড়ী জেনে গেছে।

একদিনের কথা। ভালজাঁ বুড়ী ঝি'কে ডেকে একশো টাকার একখানা নোট দিয়ে বললেন,—বুঝলে, কাল কোম্পানীর কাছ থেকে মাস কয়েকের সুদ পেলাম। ক'দিন থেকেই টাকাটা পাবো-পাবো ভাবছিলাম। যাও বাইরে কোন দোকান থেকে টাকাটা ভাসিয়ে আনো।

বুড়ী নোটখানা নিয়ে বাইরে চলে গেলো। সে ভাবতে লাগলো যে, ভালজাঁ গতকাল কখন বাইরে গিয়েছিলেন। না, কাল তো ভালজাঁ দিনের বেলায় বাড়ি থেকে বেরোন নি! তার আগের দিনও না। লোকটি বলতে গেলে দিনের বেলা বাড়ি থেকে বেরোন না। গতকাল অবশ্য শেষবেলায় বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনো তো ব্যাঙ্ক খোলা ছিল না! তাহলে?

খানিকক্ষণ আগের একটি দৃশ্য বুড়ীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সে যেন কি কাজ করছিল, এমন সময় দেখতে পেলো, ভালজাঁ এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাশের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরটা সঁাতর্দেঁতে। ভাড়াটে থাকে না। সে ঘরে ভালজাঁকে কোনদিন বুড়ী যেতে দেখেনি।

ভালজাঁ ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। বুড়ীর ভারী কৌতূহল হলো। কোজেত তখন ধারে-কাছে ছিল না। বুড়ী পা টিপে-টিপে সেই ঘরের দিকে এগোলো। দরোজার গায়ে ছিল ছিদ্র। বুড়ী সেই ছিদ্র দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওপাশে।

ওপাশে ঘরের মধ্যে ভালজাঁ গায়ের কোটটি কাঁচি দিয়ে কাটছেন তা' দেখে বুড়ীর চোখ ছানাবড়া! একি কাণ্ড! লোকটার মাথায় ছিট আছে নাকি! দৃষ্টিটা আরো ঝানকিটা সরে আসতে বুড়ী দেখতে পেল, ভালজাঁ কোটের এক জায়গায় সেলাই কাটছে। তারপর এক সময় সেলাই খুলে কোটের সে জায়গার আস্তরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একতড়া কাগজ বের করলেন। বুড়ীর চোখ এবার আরো ছানাবড়া! আরো! এ দেখি টাকার নোট মনে হচ্ছে! আবার মনে হলো; বোধ করি কাগজের তাড়াই। তার চোখে ধান্দা লেগে গেলো। ভালো করে চোখ খুলে আবার ফাটল দিয়ে তাকালো। ভালজাঁ ততক্ষণে কাগজের তাড়া থেকে একটা কাগজ নিয়ে বাকীটা কোটের সেই আস্তরের মধ্যে রেখে দিয়ে সেলাই করে মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে। বুড়ী ঝি'র মনে হলো, সে কাগজটা ভালজাঁ বাইরে রেখেছেন তা' যেন টাকার নোট। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে বুড়ী দরোজার পাশ থেকে সরে গেল।

বেশ ক'দিন পরের কথা। ভালজাঁ ও কোজেত বাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক কোথাও ছিল। বুড়ী ঝাড়ামোছা করছিল। দেয়ালের গায়ে পেরেকের ঝোলান ছিল ভালজাঁর কোট।

বুড়ীর দারুণ কৌতূহল। সে এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে কোটটা পেরেক থেকে নামালো। এমন জিনিস নেই, যা কোটের পকেটে নেই। সুই-সুতা, কাঁচি, এক বাঙাল কাগজ, বড় একটা ছুড়ি আর নানা ধরনের নানা রংয়ের পরচুলা। কোটের ভেতরের দিকে একটি সেলাই করা মুখ বন্ধ পকেট। পকেটের মধ্যে একতড়া কাগজ। এগুলো আসলে কি?

ভালজাঁর সেই ভাড়াটে বাড়ির অদূরে ছিল একটা গীর্জা। এই গীর্জার সামনে একটি পুরানো নষ্ট কুয়ার সামনের চত্বরে বসে এক বৃদ্ধ ভিথরী ভিক্ষা করতো। বয়স তার সত্তর পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভিথরী একটি হারিক্যান নিয়ে সেই কুয়ার ধারে বসতো। বসে-বসে সে ধর্ম জপ করতো। এই বুড়ো ভিথরী আগে ছিল ঐ গীর্জারই চৌকিদার। পরে চাকুরি যাবার পরে ভিক্ষে শুরু করে। কেউ-কেউ আবার তাকে পুলিশের গুচ্চর বলে সন্দেহ করতো। ভালজাঁও তেমন কোন সন্দেহ করতেন কিনা জানি না। তবে যেদিনই তিনি বেড়াতে বেরোতেন, সেদিনই দু'এক পয়সা ভিথরীটিকে দিতেন। ভালজাঁ ভিক্ষে দেয়ার ব্যাপারে অবশিষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইতেন। কিন্তু আগেই বলেছি, কেউ-কেউ ভালজাঁর এ ধরনের ভিক্ষাদানের কথা জেনে গিয়েছিল।

ভালজাঁ ভিথরীর হাতে ভিক্ষে দিয়ে মাঝে-মাঝে দু'একটা কথাবার্তাও বলতেন। ভিথরী পয়সা পেয়ে ভালজাঁর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতো,—সর্বশক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু একদিন এর ব্যতিক্রম হলো।

ভালজাঁ এগাড়ার আসার মাস ছ'য়েক পরের কথা। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরিয়ে সেদিনও ভালজাঁ অভ্যাসমত ভিথরীর হাতে কিছু পয়সা দিলেন। হারিক্যানটি সামনে রেখে ভিথরীটি তখন মাথা ঝুঁজে বসেছিল। মনে হচ্ছিল, রোজকার মতো সে বসে-বসে জপ করছে।

হাতে পয়সা দিতেই ভিথরীটি চট করে মুখ তুলে ভালজাঁকে এক পলক দেখেই আবার মাথা নীচু করলো। আর কোন কথা বললো না। হারিক্যানের আলোয় ভালজাঁ ভিথরীর মুখ দেখে চমকে উঠলেন। শুষ্কতার মতো তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত চলাচল বেড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে কে যেন হাতুড়ী পেটানো শুরু করেছে। মনে হচ্ছে যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ভালজাঁর মনে হলো, হারিক্যানের আলোয় এক পলকের জন্যে যে মুখ তিনি দেখতে পেয়েছেন, তা তাঁর পরিচিত ভিথরীর শান্ত, উজ্জ্বল মুখ নয়। এ মুখ ভাবলেশহীন। এ মুখ অন্য কারো! যে ভিথরীটি মাথা ঝুঁজে বসে রয়েছে, তাকে দেখে ভালজাঁর চকিতে মনে হলো তিনি যেন একটি সাপের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিমূঢ় অবস্থায় ভরে বিষয়ে তিনি থ' মেরে ভিথরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু এ সব মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ভালজাঁ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সন্ধি ফিরে পেলেন। তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তখন তাঁর মনে হলো, কোন কথা না বলে স্বাভাবিক ভাবে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে যাওয়া উত্তম।

সেদিন আর বেড়াতে যাওয়া হলো না। চিন্তামগ্ন মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ভালজাঁ। চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে রইলেন। কোজের ভাঁকে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার কি হয়েছে বাবা?

ভালজাঁ বললেন,—কিছু না।
—আহলে তুমি ঘরে আলো জ্বালাওনি কেন? অন্ধকারে চুপ করে বসে রয়েছে কেন?

ভালজাঁ কোজের কথায় কোন জবাব দিলেন না।

কোজের এবার ভালজাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললো,—আমি বলবো তুমি কি করছিলে? তুমি এই অন্ধকারের মধ্যে বসে আপনমনে বিড়-বিড় করে বলছিলে,—এ কি করে সম্ভব! না, না, আমারই বোধহয় চোখের ভুল! দূর ছাই, আমি পাগল হয়ে পেলাম। বলো বাবা, তুমি এসব বলছিলে না? বলো না, এমনভাবে বসে রয়েছে কেন! কি হয়েছে? আমাকে বলতেই হবে।

ভালজাঁ বললেন,—কিছু না মা, ভাবিলাম।

—কি ভাবছিলে? কোজের জিজ্ঞেস করলো।

ভালজাঁ এবার উঠে দাঁড়াবেন। বললেন,—কিছু না মা! শুধু মিছিমিছি ভাবনা। যাও তুমি আলো জ্বালাও তো।

কিন্তু সারারাত তাঁর প্রায় ঘুমহীন কাটলো। তিনি ছটফট করছিলেন। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, ভিথরীর মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হলো, যেন ইস্পেষ্টর জাভের! আশ্চর্য, সে কি ভিথরীর বদলে ওখানটায় ছদ্মবেশ ধরে বসেছিল?

পরদিন বিকেল হতেই ভালজাঁ কেমন যেন ছটফট করছিলেন। সন্ধ্যা হলো। ভালজাঁ বেড়াতে বেরোলেন। তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গীতে পা চালিয়ে তিনি চললেন। তখন আবার মনে হচ্ছিল, কোন অস্থিতি, কোন দৃষ্টান্তই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গীর্জার সামনে কুয়ার কাছে ভিথরীটি তার নিছকের জায়গায় বসে রয়েছে।

ভালজাঁ তার সামনে গিয়ে বললেন,—কি খবর ভাই? কেমন আছ? সব ভালো তো? বলে তিনি তার হাতে কয়েকটি পয়সা ঝুঁজে দিলেন। ভিথরী মুখ তুলে তাকিয়ে আগের মতো সেই কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো,—সর্বশক্তিমান ইশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ভালজাঁ কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পলকহীন ভাবে ভিথরীকে তিনি জরিপ করলেন। না, তাঁরই ভুল হয়েছিল। এতো সেই চৌকিদার ভিথরীই। ভালজাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। আপন মনেই তিনি হেসে উঠলেন।

এরও দিনকয়েক পরের কথা। রাত তখন প্রায় আটটা। কোজের পড়ছে। ভালজাঁ তাকে পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি শব্দে ভালজাঁ কান খাড়া করলেন। কে যেন বাড়ির সদর দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। সাথে-সাথেই দরোজা বন্ধ করারও শব্দ শোনা গেল।

ভালজাঁ ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে কোজের কপাল চূপ করে থাকবার জন্য ইশারা দিলেন। ব্যাপারটি তার কাছে খুব ভাল লাগছিল না। বাড়িতে সে সময় ভালজাঁ ছাড়া আর কোন ভাড়াটে নেই। এদিকে বুড়ী হলো হাড়কিপটে। কিভাবে দু'পয়সা খরচ বাঁচানো যায়, সেদিকেই তার লক্ষ্য। তাই রাতে আলো জ্বুলে খরচ বাড়ানোর চেয়ে সে সন্ধ্যা হতে না হতেই রাতি নিভিয়ে বসে পড়ে। ভালজাঁ ভাবছিল—সদর দরোজা খুলে কে এলো!

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে খানিক পরই পায়ের শব্দ শোনা গেলো। কে যেন ওপরে আসছে। ভালজাঁ প্রথমে ভেবেছিল,—বুড়ীই বোধহয় কোন কাজে বাইরে গিয়েছিল।

সে ফিরছে। কিন্তু পায়ের শব্দ শুনে মনে হলো, এতো বুড়ী নয়! বেশ ভারী জুতোর পায়ের শব্দ। নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ! আবার মনে হলো, বোধহয় তার পুরু সোলের জুতা পরেই বাইরে গিয়েছিল। বুড়ী ঐ পুরু সোলের জুতা পড়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন ওঠানামা করে, তখন খানিকটা ওরকমের শব্দ হয়।

ইতোমধ্যে ভালজাঁ ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন। কোজেন্তকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছেন,—চুপ করে শুয়ে থাকো। খবরদার টু শব্দটি করো না। তারপর ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে তিনি দরোজার দিকে পেছন ফিরে চুপ করে রইলেন।

সিঁড়ি বেয়ে পায়ের শব্দটি উপরে এলো। ভালজাঁ সজাগ। ভালজাঁর ঘরের সামনে এসে পায়ের শব্দটি থেমে গেল। কে যেন এসে দরোজার সামনে দাঁড়ালো। তারপর পায়ের শব্দটি ওপাশে চলে গেল এবং সাথে-সাথেই আবার ফিরে এলো। দরোজার কাছে এসে পায়ের শব্দ থেমে গেল।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভালজাঁ কান খাড়া করে রইলেন। দরোজার গায়ে পেছন ফিরে তিনি বসে রয়েছেন, তাঁর সমগ্র দৃষ্টি দরোজার ওপাশের পদশব্দের প্রতি। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না! যেন দম বন্ধ করে তিনি বসে রয়েছেন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত পড়িয়ে যাচ্ছে। দরোজার ওপাশে এসে পদশব্দ সেই যে থামলো, তারপর কোন সাড়া নেই। এমনি করে খানিকক্ষণ কেটে গেল। ভালজাঁ ধীরে-ধীরে পেছন ফিরলেন। সে নিশ্চিত যে, দরোজার ওপাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করছে? দরোজার ছিদ্রপথ দিয়ে ভালজাঁ বাইরে তাকালেন। চারদিকে আঁধার আর তার মধ্যে তিনি ছোট একটি আলোর রেখা দেখতে পেলেন। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়? পায়ের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। তবে বোধহয় লোকটি তার পায়ের জুতা খুলে ফেলেছে। খানিক পর বাইরের সেই আলোটিও দেখা গেল না আর।

আরো কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় চুপ করে বসে রইলেন ভালজাঁ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন। গায়ের জামা কাপড়সহ তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখে যে ঘুম নামে না! অতীত আর ভবিষ্যতের নানা রকম সব দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিজের অজান্তে কখন একটি দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে; তার সেই দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তিনি নিজেই শিউরে উঠেন! এমনি করে এগিয়ে চললো বিনীদ রাতের প্রহরগুলো।

ভোরের দিকে তাঁর একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। পাশের ঘরের দরোজা খোলার শব্দে তাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তিনি গভীরতের সেই পদশব্দ শুনে পেলেন। চটপট বিছানা থেকে উঠে দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরোজার ছিদ্র দিয়ে তিনি বাইরের দিকে দেখতে পেলেন একটি লোক বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটিকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করছিলেন ভালজাঁ। কিন্তু ভোরের আলো তখনো ডালো করে ফোটেনি। বারান্দার আবছা অন্ধকার। লোকটি এবার আর ভালজাঁর ঘরের সামনে দাঁড়ালো না। সোজা হেঁটে চলে গেলো। সিঁড়ির কাছে যেতে আলোতে এবার লোকটাকে ভালো করে

দেখতে পেলেন ভালজাঁ। লম্বাটে গড়ন, হাতে একটি মোটা লাঠি, গায়ে লম্বা একটি কোট। দেখতে ইসপেট্টর জাভেয়রের মতো।

প্রতিদিনের মতো বুড়ী ঝি সকালে কাজে এলো। আর সব দিনের মতোই স্বাভাবিকভাবে ঘরদোর ঝাঁট দেয়া ও গেরস্থালীর কাজ করে যেতে লাগলো। ভালজাঁ সজাগ দৃষ্টিতে সব লক্ষ্য করছিল।

ঘর ঝাঁট দিতে-দিতে একসময় বুড়ীই ভালজাঁকে জিজ্ঞেস করলো,—কালরাতে ভালো ঘুম হয়েছে তো? আপনার চোখ কেমন ফোলা-ফোলা লাগছে?

ভালজাঁ জবাব দিল,—হ্যাঁ, তেমন ঘুম হয়নি কাল রাতে।

বুড়ী আবার বললো,—কাল রাতে নতুন একজন ভাড়াটে এলো। আপনি গতরাতে কোন সাড়াশব্দ পাননি? রাত আটটা-সাতটা আটটার দিকেই এলেন ভদ্রলোক। আমি ভাবলাম আপনি বুঝি টের পেয়েছেন।

ভালজাঁ স্বাভাবিক নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, পেয়েছি তো। তাহলে উনি নতুন ভাড়াটে? বেশ ভাল কথা। তা ভদ্রলোক কি করেন? কি নাম তার?

—কি করেন তা' পুরোপুরি জানি না। তবে শুনলাম আপনার মতোই জমানো টাকায় চলে। ব্যাঙ্কে বোধহয় টাকা পয়সা আছে কিংবা হয়তো কোম্পানীর টাকায় চলে। কোম্পানীর কাগজ আছে! তা' আমি ওসব বেশি জিজ্ঞেস করিনি। নামটাও ঠিক মনে পড়ছে না, কি যেন, দুম্ না ও ধরনের কি একটা নাম বললো। চেনেন নাকি আপনি?—বুড়ী তার দিকে তাকালো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। সারাদিন ভালজাঁর নানা চিন্তায় কেটেছে, আচ্ছা বুড়ীর কথার মধ্যে কি কোনো ইঙ্গিত আছে? হয়তো নেই, কিন্তু ভালজাঁর মনে হলো, হয়তো বা আছে। কারণ বুড়ী সাধারণত এমন ভনিতা করে কথা বলে না।

ভালজাঁ যাকে দেখছেন সে ইসপেট্টর জাভেয়র কিনা, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। আবার সে যে জাভেয়র নয়, সেটাও সঠিক বলতে পারছিলেন না। ভালজাঁ ভাবতেন, আমি তো মরে গেছি বলেই পৃথিবীর লোক জানে। আর এতো আমার ছদ্মবেশ! ইসপেট্টর জাভেয়র তাঁকে কি চিনতে পেরেছে? এ ব্যাপারেও ভালজাঁ নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। গত কিছুদিনের কয়েকটি ঘটনায় ভালজাঁ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। নতুন একটি জায়গার সন্ধান তাঁকে করতে হবে।

সন্ধ্যা হতেই দ্রুতপায়ে ভালজাঁ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। রাস্তায় লোক চলাচল বলতে গেলে নেই। ভালজাঁর মনে হলো রাস্তার গাছগুলোর আড়ালে কোন লোক হয়তো গুঁত পেতে রয়েছে।

তিনি ভাড়াভাড়ি ঘরে ফিরে এলেন। কোজেন্তকে বললেন,—আমার সাথে চলে এসো কোজেন্ত। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। কোন রকম টু-শব্দ করো না।

সকালে বুড়ী ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে যাবার পর ভালজাঁ তার দেরাজে যা' টাকা-পয়সা ছিল, তা একত্রে খলেতে ভরে নিয়েছিলেন।

ধীরে-ধীরে কোজ্জের হাত ধরে ভালজা বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেউ দেখলে মনে করবে তিনি প্রতিদিনের মতো সাদা ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

রাস্তার অনেকটা জোছনার আলোয় আলোকিত। সাথে-সাথে আবার রাস্তার অনেকটা ছায়াঢাকা। সেই ছায়াঢাকা পথ দিয়ে ভালজা চলছিলেন। এর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি খানিকক্ষণ বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারী করেছেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে কিনা, তা বোঝার জন্য তিনি এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কি করছেন, তার কোন কিছুই ঠিক করেন নি। ছায়াঢাকা অস্পষ্ট অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটছিলেন ভালজা, আর আলোকিত অংশে চলাচলকারী লোকজনের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। কিন্তু রাস্তার বেসিকটা অন্ধকার অর্থাৎ ভালজা বেসিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেদিকে চলাচলকারী লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারছিলেন না। ভালজা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁকে কেউ অনুসরণ করতে পারে! কিংবা তিনি মনে করেছিলেন, অন্ধকারে লুকিয়ে কেউ তার পিছু নেয়নি। আর নিয়ে থাকলেও তিনি তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন কিংবা তাদের চোখের আড়ালে এসে গেছেন। তিনি এ-পথ সে-পথ, এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে এতক্ষণ এজন্যই নানাভাবে পথ চলেছেন।

রাত তখন প্রায় এগারোট। ঘুরতে-ঘুরতে ভালজা ও কোজ্জের তখন কোতোয়ালী থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, রাতে কোথায় থাকবেন ভালজা তা তখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি! ওদিকে থাকা-খাওয়ার মতো বেশ কয়েকটা হোটেল ছিল, কিন্তু ভালজা সেসব হোটেলে থাকা উচিত মনে করেননি। রাতের আঁধারে ছোট কোজ্জেরকে নিয়ে তিনি বলতে গেলে তখন এলোপাথাড়ি পথ চলছেন—আলো বাঁচিয়ে অন্ধকারে গা ঢেকে পথ চলছেন। মনে শুধুই শঙ্কা।

পথ চলছিলেন আর চারদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে তাকাচ্ছিলেন। কোতোয়ালী থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পিছু ফিরে তাকাতেই ভালজা দারুণ চমকে উঠলেন। কোতোয়ালী থানার অফিস ঘরের কক্ষগুলো থেকে রাস্তায় আলো পড়ছে, তাছাড়া রয়েছে জোছনা, সেই আলোর ভালজা দেখতে পেলেন তিনজন লোক তাদের দিকে আসছে। তাদের ভাবভঙ্গী যেন কেমনতরো, মনে হলো যেন তাকে অনুসরণ করছে। তাদের মধ্যে একজন খানিকদূর এসে আবার কোতোয়ালী থানার দিকে ফিরে গেল।

ভাব-গতিক সুবিধের মনে হলো না ভালজার। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ভালজা চলতে লাগলেন। ওরাও এগোতে লাগলো। ভালজা চট করে পাশের একটি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ছোট সড় গলি। জোছনার আলো গলির মধ্যে না পড়ায় অন্ধকার। সে-গলি থেকে ও-গলি, ও-গলি থেকে পরের গলি, এমন করে গলি পেরিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। সাত আটটা গলি পেরোনোর পর একটি খোলা মাঠের মতো জায়গায় তারা বসে পড়লেন। অনুসরণকারীদের একজন সেই গলিতে তার পিছু-পিছু আসছিল বলে ভালজার মনে হলো। লোকটাকে ভাল করে দেখার জন্য এবং আত্ম-গোপনের জন্য ভালজা পার্কের কোণে একটি বাড়ির দেয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকোলেন।

কিছুক্ষণ পরই সেই লোকগুলো কাছে এসে পড়লো। সংখ্যায় তারা চারজন। পরনে তাদের লম্বা কোট, হাতে লাঠি, মাথায় টুপি। পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকগুলো। এধার ওধার অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি যেন দেখতে লাগলো।

ভালজা সেই বাড়ির দেয়ালের আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলেন। চারজনের মধ্যে যাকে দলপতি বলে মনে হচ্ছিল, তার চেহারা ভালো করে তিনি তখনো দেখতে পাননি। সে ভালজার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ভালজার মনের মধ্যে তখন এক দারুণ আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। আলোড়ন অবশ্য শুরু হয়েছে সেই গভীরকাল থেকেই, কিন্তু এখনই তা এমন চরম আকার ধারণ করলো। ভালজা ভাবছিলেন, আমি তো পৃথিবীর লোকের কাছে মৃত! কিন্তু এরা কে? এই রাত দুপুরে ওরা কি চায়? ওরা কি চোর? ডাকাত? নাকি ভদ্রবেশি লোক? নিষ্ঠুর দানব বিশেষ? আমাকে তারা অনুসরণ করছে কেন? এরা কি পুলিশের লোক? কিন্তু আমি যে ভাল হয়ে থাকতে চাই, আমি সংপথে থাকতে চাই। আমি যে নবজন্ম লাভ করেছি ঈশ্বর।

কোজ্জের তাঁর গায়ের সাথে সেটিয়ে রয়েছে। ভালজা তাকে দু'হাত দিয়ে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলেন। এমন সময় দলপতি গোছের লোকটি তার দিকে মুখ ঘোরালেন। জোছনার আলোয় তার মুখ এবারে ভাল করে দেখতে পেলেন ভালজা। সাথে-সাথে তার শরীরের রক্ত যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত উথাল-পাখাল করে ছুটে গেল। এ যে সেই ইসপেক্টর জাভের!

ভালজার মনে আর কোনই সন্দেহ নেই। গত ক'দিনের ঘটনা তাঁর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। ইসপেক্টর জাভেরর তাঁকে ধরার জন্যে ইতোমধ্যে ঘুরছে। ভালজা আবার ভাবছিলেন—জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে ইসপেক্টরের কি কোন সন্দেহ রয়েছে? সে কি তাঁকে সত্যি-সত্যি চিনতে পেরেছে?

কিন্তু আর দেরি নয়। ইসপেক্টর জাভেররের দলবল তখনো বোধহয় কি করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। তারা দাঁড়িয়ে বোধহয় জল্পনা-কল্পনা করছে। এই সুযোগে ভালজাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, এদের চোখের আড়ালে চলে যেতে হবে। অনেক দূরে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভালজা দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। পাশেই ছিল একটি সরু গলি; তার মধ্যে তিনি ঢুকে পড়লেন। কোজ্জের তখন ভয়ে একেবারে কঁচোর মতো হয়ে গেছে। ছোট্ট মেয়ে হলেও সে এটুকু আঁচ করতে পেরেছে যে, খাবার নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটেছে, নইলে তিনি এমন করেছেন কেন? এদিকে ক্লান্তিতে কোজ্জের আর চলতে পারছিল না। কোজ্জের বললো,—বাবা! আমি আর হাঁটতে পারছি না।

এতক্ষণ কোজ্জেরকে হাতে ধরে অনেকটা আচ্ছন্নের মতো পথ চলেছেন ভালজা। কোজ্জেরের কথায় তিনি চমকে উঠলেন,—তাইতো যা! তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? কোজ্জেরকে কাছে ভুলে নিয়ে আবার তিনি পথ চলতে লাগলেন; আগের চেয়ে অনেক দ্রুতপায়ে।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে এক সময় ভালজা নদীর পারে এসে পৌঁছলেন। নদীর ওপর দিয়ে সেতু চলে গেছে এপার থেকে ওপারে। ভালজা তখন ভাবছিলেন, এবার তিনি কি করবেন? পেছন ফিরে তাকালেন। না, ইসপেটর জাভেরের শোকজনকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তা হলেও বসে থাকা চলবে না। পার্ক থেকে চলে আসার পরপরই জাভের হয়তো তার পিছু নিয়েছে। এফুনি হয়তো সে এসে পড়বে। ভালজা ভাবলেন,—এ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো।

সেতুতে তখন লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সেতুর ইজারাদারের একটি লোক এপাশে মোতায়েন রয়েছে। সে সময় ঐ সেতু পারাপারের জন্যে টোল আদায় করা হতো।

ইজারাদারের সেই লোকটিকে সেতুর পারাপারের ভাড়া দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ভালজা, এমন সময় লোকটি তাকে বাধা দিলো। বললো,—এ কি সাহেব, একজনের ভাড়া দিচ্ছেন যে? কাঁধের খুকীও তো বেশ সেয়ানা! ইটতে-চলতে পারে না? তার ভাড়া কই?

ভালজার মন বিগড়ে গেল। কাউকে কোন সংবাদ দিয়ে তিনি যেতে চাচ্ছিলেন না। কোন রকম সোরগোল না করে তিনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন।

যা হোক, কোজেতের ভাড়া দিয়ে তিনি সেতুর উপর উঠে পড়লেন। এ সময় একটি মাল বোঝাই গাড়ীও ওপার যাচ্ছিল। ভালজা সেই গাড়ির ছায়ায় লুকিয়ে সেতু পার হতে লাগলেন। সেতুর মাঝ বরাবর এসে কোজেত বললো,—আমি কাঁধে চড়ে যাবো না বাবা। আমি আবার তোমার মতো হেঁটেই যাবো। আমাকে নামিয়ে দাও না। কাঁধে বসে যেতে কষ্ট হচ্ছে। ভালজা তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন।

সেতু থেকে নদীর ওপারে নেমে ডানধারে ভালজা কয়েকটি কাঠের গোলা দেখতে পেলেন। ভালজা ওদিকে যাওয়াই স্থির করলেন। প্রথমে খানিকটা দ্বিধা ছিল। কাঠের গোলাগুলোর দিকে যেতে হলে কিছুটা পথ একেবারে খোলা-মেলা হেঁটে যেতে হবে। রাস্তার আশে-পাশে কোন ঘর-বাড়ি বা গাছপালাও নেই। জ্যোছনার আলায় চারধার আলোকিত। ওই পথটুকুতে অন্তত নুকোচুরির কোন সুযোগ নেই। ভালজা ভাবলেন, নদীর এপারে এখন অবশ্য আগের মতো তেমন বিপদের আশঙ্কা নেই। ইসপেটর জাভের ও তার লোকজন তাকে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন তো হতে পারে, নদীর এপারে তারা ভালজার পিছু নেয়নি। সব দ্বিধা বেড়ে ফেলে ভালজা কাঠের গোলাগুলোর দিকে এগোতে লাগলেন।

গোলাগুলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভালজা দুটো গোলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি সরু অন্ধকার গলির মুখে এসে দাঁড়ালেন। মনে-মনে খানিকটা খুশীও হলেন। যাক, এই গলি দিয়ে গেলে অসুবিধার তেমন কোন কারণ নেই। গলিতে ঢুকবার মুখে ভালজা পিছু ফিরে তাকালেন। আর তাকিয়েই তার বুক ভরে দুলে উঠলো। এ জায়গা থেকে পুরো সেতুটা জ্যোছনার আলায় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পিছু তাকিয়ে ভালজা দেখতে পেলেন, চারজন লোক সেতুটার উপর দিয়ে হেঁটে এদিক আসছে। তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

ভালজা ভাবলেন, তাহলে এতক্ষণ আমি আকাশ-কুসুম কল্পনা করেছি। এরা যে ইসপেটর জাভেরের দলবল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জাভের ঠিকই পিছু নিয়েছে, ব্রাণ ঠেকে-ঠেকে আসছে। ভালজা নিজেই নিজেকে অভয় দিতে লাগলেন—ভবু ভাগ্য ভালো। খোলা-মেলা পথটুকু অভিক্রমের সময় তারা সেতুর উপর আসেনি, তাই ভালজা কোনদিকে গেছে তা এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু জাভের হালো পাকা ঘুঘু। সহজে ছাড়ার পাত্র সে নয়। ভালজাকে সে সহজে রেহাই দেবে না।

ভালজা সেই সরু অন্ধকার গলি দিয়ে এগিয়ে চললেন। দ্রুতপায়ে হেঁটেছিলেন ভালজা। রাতের মতো একটা আশ্রয় তো খুঁজে নিতে হবে। কিংবা কোথাও লুকিয়ে থাকার জায়গা আপাততঃ বের করতে হবে। ভালজা এই কাঠের গোলার দিকে এসেছে তা জাভের বুকতে পারার আগেই যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে।

আধার গতিপথে ধাক্কা খেতে-খেতে দ্রুতপায়ে হেঁটে চমকছিলেন ভালজা। কিন্তু হঠাৎ সামনে দেখলেন উঁচু এক দেয়াল পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-ধারে ও-ধারে আর কোথাও যাবার পথ নেই। ভালজার বুকের মধ্য দিয়ে তখন ড্রাম পিটছে। আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তার হাত তখন ধরতর করে কাঁপছে। এ যে দেখি একটা কানা গলি! এবার উপায়! এখন আর পিছু ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। জাভের আর তার সঙ্গীরা হয়তো ততক্ষণে গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো বা এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভালজা হটফট করতে লাগলেন। কি করা যায়।

ভালজার বুকের ধুক-ধুকনি তখন আরো বেড়ে গেছে। না-না, আর দেরি নয়। এই দেয়াল টপকিয়ে ওধারে যেতে হবে। কিন্তু ওদিকে কি আছে? দেয়াল পেরিয়ে তাঁরা কোথায় নামবেন? সেখানেও যদি কোন বিপদ ভঁত পেতে থাকে? কারাই বা থাকে এ প্রকাণ্ড দেয়াল ঘেরা বাড়িতে? ভালজা আর কিছু ভাবতে চাইলেন না।

দেয়ালের গাঁথুনি ভাল করে দেখতে লাগলেন ভালজা। তারপর তার কোটের পকেট থেকে একটি হাতুড়ী ও বেশ সুঁচালো লোহার একটি শলা বের করে দেয়ালের ইটের ফাঁকে ঠুকে বসিয়ে চাড় দিতে লাগলেন। সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিতেই ইটখানা খানিকটা আলগা হয়ে গেলো। আরেক চাপ দিতেই ইটখানা খুলে গেলো। উত্তেজনায় তখন ভালজার সারা শরীর কাঁপছে। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। একটির পর আরেকটি, তার উপরে আরেকটি এমনি করে কয়েকটি ইট তিনি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। একটা মোটা দড়ি কোজেতের কোমরে বেঁধে দিলেন। পায়ের জুতো জোড়া দেয়ালের ওপাশে ফেলে দিলেন। তারপর দড়ির আরেক প্রান্ত হাতে নিয়ে ক্ষিপ্তগতিতে দেয়ালের সেই গর্তে পা দিয়ে টিকটিকির মতো বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। দেয়ালের উপরে উঠে তিনি ওপাশটা দেখে নিলেন। তারপর দড়ি ধরে কোজেতকে দেয়ালের উপর টেনে তুলে ধীরে-ধীরে ওপাশে নামিয়ে দিলেন। দেয়ালের গা ঘেঁষে একটি গাছের ডাল ধরে ভালজা নিজে তারপর নিচে নেমে গেলেন। এদিকে জাভের ও তার সঙ্গীরা গলির মধ্যে এসে পড়েছে। অতিপাতি করে গলির এখানে-সেখানে তারা ভালজা ও কোজেতকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। দেয়ালের কাছেও কয়েকবার ঢু মারলো। কিন্তু ভালজা দেয়াল পেরিয়ে চলে গেছেন একথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। এত তাড়াতাড়ি ঐ

উঁচু দেয়াল একটি বৃদ্ধ লোক আরেকটি কিশোরীকে নিয়ে পেরিয়ে গেছেন তা জাভেরর ভাষতে পারেনি।

দেয়াল থেকে নিচে যেখানে নামলেন ভালজাঁ তার অদূরে পুরনো একটা বাড়ি। বাড়িটির গায়ে জায়গায়-জায়গায় ফটিল ধরেছে। এপাশে রয়েছে পুরোনো ভাস্মা একটি কুঁয়ো। জায়গাটিকে একটি অতি পুরানো বাগান বাড়ি বলে ভালজাঁর মনে হলো। ততক্ষণে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। ভালজাঁ ভাল করে সব কিছু ভাই দেখতে পরছিলেন না। দূরে সব কিছু কুয়াশায় আপসা লাগছে। দূরে আরেকটি বাড়ির মতো কি যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঘুরে ঘিরে না দেখেও ভালজাঁর মনে হলো বেশ বড় এলাকা নিয়েই বাগান বাড়িটি করা হয়েছে।

ভালজাঁ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার আশেপাশে জঙ্গল। খানিকটা জায়গায় শাক-সব্জির চাষ করা হয়েছে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটি ফল-ফুলের গাছ। অদূরে সেই পুরোনো বাড়িটি থেকে লোকজনের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। ভালজাঁও ভাবলেন যে এ বাড়িতে কোন লোকজন থাকে না। সেই বাড়ির ছাদহীন খোলা চত্বরে কোজেতকে তিনি ওইয়ে দিলেন।

শীতে কোজেত তখন কাঁপছে। তাছাড়া, সমস্ত ঘটনাটি তার কাছে কৌতূহলপ্রদ মনে হচ্ছিল। ভয় যে পায়নি তাও নয়। কিন্তু সে এটুকু বুঝতে পারছিল যে, চারধারে বিপদ ঝুঁপেতে রয়েছে। সে সুযোগ পেলেই ভালজাঁকে আঁকড়ে ধরবে।

বাইরে দেয়ালের ওপাশে জাভেরর ও তার লোকজন তখনো হন্যে হয়ে ভালজাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের কথাবার্তা ও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভালজাঁকে না পাওয়ায় জাভেররের ক্ষোভও ভালজাঁ অনুভব করলেন। তিনি চুপচাপ রইলেন। মনের মধ্যে তাঁর তখনো ঝড়ু বইছে। ভয় এই বুঝি জাভেরর দেয়াল টপকাবার খবর টের পেয়ে যায়।

খানিকপর জাভেরর তার লোকজন নিয়ে সেই গলি থেকে বেরিয়ে গেল। ভালজাঁ তা বুঝতে পেরে এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। মনের মধ্যে ঝড়ের দাপাদাপি কমে এলো। আর তখনি তাঁর কোজেতের কথা মনে হলো।

মৃতের মতো তার গায়ের সাথে হেলান দিয়ে আছে কোজেত। তার চোখ দুটো বোঁজা। গায়ে হাত দিয়ে ভালজাঁ দেখলেন মেয়েটার সারা শরীর বরফের মতো শীতল। ভালজাঁ তাঁর গায়ে মৃদু হাত বোলাতে-বোলাতে আস্তে-আস্তে ডাকলেন,—কোজেত! মা মনি!

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না! ভালজাঁ দারুণভাবে চমকে উঠলেন—তবে, তবে কি কোজেত মারা গেছে! সেই থেকে কচি মেয়েটিকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন। বেচারীর কষ্ট হচ্ছে কিনা তাও খেয়াল করার সময় হয়নি। ভালজাঁ আবার ডাকলেন,—কোজেত! মা কোজেত! মা মনি!

কিন্তু এবারো কোন জবাব এলো না। ভালজাঁ শিউরে উঠলেন। তাঁর সারা শরীর বেয়ে একটি শীতল স্রোত যেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল। তার স্নায়ুগুলো যেন নির্জীব হয়ে আসছে।

এমনি সময় চারদিক এক স্বর্গীয় সুবাসে ভরে গেল। চারধারের নীরব পরিবেশ ধীরে-ধীরে জেগে উঠলো। নারী-কণ্ঠে কে যেন প্রার্থনাসংগীত গাইছে। কুয়াশায় যে বাড়িটি ভালজাঁর চোখের সামনে দূরে এক আপসা অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। কে গান গাইছে ভালজাঁ তা জানেন না, গানের বাণীও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু গানের সুর-মাধুরীতে তাঁর সারা অন্তর ভরে উঠলো। ভালজাঁর মনে হলো—তার মনের সব পাণ, সব ক্রন্দ, সকল দুঃখ এই সুরের করনধারায় বুঝি পবিত্র হবে, নির্মল হবে। জীবনের অতীত কৃতকর্মে অনুতপ্ত; জীবনের চাওয়া-পাওয়ার বেদনা বিধুর, অন্যায় অবিচারে আর সমাজের অর্থহীন প্রবঞ্চনা জীবনের ওপর ক্ষুর ভালজাঁর মনে হলো—শয়তানের সংগীদের অট্টহাস্য মিলিয়ে যাবার পর এই প্রার্থনাসংগীতের স্বর্গীয় সুর তাকে অভিয দিচ্ছে, তাকে দিচ্ছে সান্ত্বনা আর প্রেরণা। এই নিস্তর নীরব পরিবেশে রাতের বুকে আলোকশিখার মতো সে যেন তাকে বলছে,—ভালজাঁ, কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই ভালজাঁ। ঈশ্বর তোমার সাথে আছেন।

ভালজাঁ সেই প্রার্থনা সঙ্গীত শুনতে-শুনতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। প্রার্থনায় নীরবে আরো একজন যোগ দিল। সে কোজেত। শীতে এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পরিশ্রমে সে একেবারেই নেতিয়ে পড়েছিল। সে সব কিছুই তখনো আধা-আধা অনুভব করছিল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারেনি। শীতে তার শরীর হিম হয়ে গেছে।

এক সময় গান থেমে গেল। তারও কিছু পর ভালজাঁর ধ্যান ভাঙলো—সঙ্গীতের সুরে তিনি আরেক জগতে চলে গিয়েছিলেন; যখন খেয়াল হলো তখন গান থেমে গেছে। চারদিকে সেই নীরব নীস্তর পরিবেশ। কোথাও কোন শব্দ নেই; নিবুম রাত। বাতাসে শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি। এ সব কিছুতেই সেই স্বর্গীয় গানের রেশ।

ভালজাঁ আবার ধীরে-ধীরে ডাকলেন,—কোজেত, মা মনি আমার!

এবার কোজেত সাড়া দিল। ভালজাঁ তার কাছে আরো হুঁকে বসলেন। গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন,—মা মনি! তোমার ঘুম পেয়েছে?

কোজেত কোন মতে জবাব দিল,—আমার খুব শীত লাগছে বাবা; অনেকক্ষণ থেকেই লাগছে।

ভালজাঁ ভাড়াভাড়ি গায়ের কোট খুলে কোজেতের সারা দেহ ঢেকে দিলেন। নাকী পরীক্ষা করে দেখলেন বড় দুর্বল ওর শরীর। একটু আঙুন দরকার। নইলে শীতে মেয়েটি মরে যাবে। গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে ভালজাঁ আবার জিজ্ঞেস করলেন,—এখন শীত একটু কম লাগছে, মা মনি? একটু আরাম লাগছে?

কোজেত ধীরে-ধীরে মাথা নত করলো।

ভালজাঁ বললেন,—আমি একটু আসছি মা। তুমি এখানে থাকো। তোমার কোন ভয় নেই।

একটু আঙুন, একটু আশ্রয়ের খোজে ভালজাঁ বেরিয়ে গেলেন। একটু ভাল আশ্রয়, একটু আঙনের খোজে পুরানো সেই ভাস্মা বাড়ির চত্বর থেকে ভালজাঁ বেরিয়ে এলেন।

কুয়াশার ঝাঁপসাভাবে যে বড় বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল ভালজাঁ সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। বাড়ির দরোজা-জানালা সব বন্ধ।

খানিক পর ভালজাঁ ফিরে এলেন। কোজেরে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আবার তার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণভাবে চলছে; শরীর শীতে যেন জমে রয়েছে। একটু আঙুন না হলে একে বাঁচানো যাবে না। ভালজাঁ এসব কথা ভাবছিলেন। শীতে দুশ্চিন্তায়, সন্ধ্যা থেকে ছুটে বেড়ানোর পরিশ্রমে তিনি নিজেও ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করছিলেন।

হঠাৎ ভালজাঁ একটি শব্দে চমকে গেলেন। অদূরে বাগানের দিক থেকে যেন একটি ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে—এক নাগাড়ে নয়, মাঝে-মাঝে ধেমে-ধেমে। আবিষ্ট হয়ে শব্দটি শুনতে-শুনতে ভালজাঁ উঠে দাঁড়ালেন এবং শব্দ লক্ষ্য করে ফিরে তাকালেন আর তাকিয়েই দারুণভাবে আঁতকে উঠলেন ভালজাঁ। অদূরে শাক-সজির বাগানে একটি লোক এদিকে পিছু ফিরে কি যেন করছে। লোকটি ধীরে-ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে যেন কি করছে। হাঁটার সময় ওখানে আবার একটি ঘন্টাও বাজছে। ভালজাঁর মাথার মধ্যে তখন আবার চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করছে। এই লোকটি কে? ভালজাঁকে দেখে সে যদি এতখানি চোর-চোর বলে চোঁচিয়ে ওঠে। বাড়িতে বোধহয় লোকজন থাকে, তাহলে তারা জেগে উঠবে। আশেপাশে থেকে লোকজন এসে জড়ো হবে। তারা পুলিশ ডাকবে। ভালজাঁকে তারা গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। ভালজাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। সে যে আর সবার মতোই সুন্দর সুখী জীবন সেই কবে থেকে কামনা করে আসছে, তা' কি করে বোঝাবে? সে যে সৎভাবে বেঁচে থাকতে চায়, সে যে কোজেরেকে ঘিরে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে—এ কাকে বোঝাবে! মানুষকে তাঁর আর বিশ্বাস নেই। না না, কোন মানুষকেই না।

কিন্তু কি করবেন তিনি। যে-কোনো মুহূর্তে লোকটি তাকে দেখে ফেলতে পারে। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ভালজাঁ, তারপর সোজা সেই লোকটির পিছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পকেট থেকে বেশ কিছু টাকা বের করে হঠাৎ পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে লোকটির সামনে ধরে ভালজাঁ বলে উঠলেন,—আমাকে একটু দয়া করুন ভাই। আমার কচি মেয়েটি শীতে জমে গেছে। আমিও ভীষণ পরিশ্রান্ত। একটু আঙুন, রাতের মত একটু আশ্রয়ের দরকার। নইলে মেয়েটি আমার বাঁচবে না ভাই। আপনি কে তা আমি জানি না। আর আমার পরিচয়, আমার সব বৃত্তান্ত আপনাকে বলবো, তারপর যা হয় করবেন। দয়া করে আমাকে রাতের মতো একটু আশ্রয় দিন। আমি এজন্যে টাকা দেবো। এই টাকা কচি রাখুন। দরকার হলে সকালে আরো দেবো।

ভালজাঁ একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন। উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে তাঁর সেই বাড়িয়ে দেয়া হাত কাঁপছে। লোকটি প্রথমে দারুণ ভড়কে গেল। প্রথম বিশ্বাসের ঘোর কটিয়ে উঠতেই সে পিছন ফিরলো। ভালজাঁর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে ভালজাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে উঠলো,—ফাদার মাদলেন! আপনি!!...

ভালজাঁ চমকে উঠলেন। ফাদার মাদলেন!...হ্যাঁ, এই নামেই লোকটি তাকে ডাকলো! কিন্তু ফাদার মাদলেন তো এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। শীতের রাতের এই ক্লান্ত প্রহরে এই অচেনা জায়গায় হারানো নামে তাকে আবার কেউ ডাকবে এ তিনি ভাবতেও পারেন নি।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। ভালজাঁ তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কে? এটা কার বাড়ি?

—আমি ফোশল্ভাঁ, ফাদার মাদলেন! আমি সেই ফোশল্ভাঁ। কি আশ্চর্য! আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না?

ভালজাঁ চুপ করে রইলেন। হয়তো তিনি তখনো চিনতে পারেন নি, স্মৃতির গহ্বরে তিনি এই অচেনা লোকটির চেহারা মুখটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—আমি সেই ফোশল্ভাঁ, ফাদার মাদলেন! লোকটি আবার বললো,—আমাকে আপনি গাড়ীর চাকার তলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মনে পড়ে ফাদার মাদলেন?

—ওহো! তুমি ফোশল্ভাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে। তুমি কি করছো ফোশল্ভাঁ?

—তরমুজ ঢেকে দিচ্ছি। সাঁঝরাতেরই আমার মনে হয়েছিল যে রাতে আজ দারুণ শীত নামবে; তুষার পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু ফাদার মাদলেন! আপনি এখানে এলেন কি করে?

—বলছি ফোশল্ভাঁ, সব বলছি। আমি বড় ক্লান্ত ভাই। তোমার হাঁটুতে ঘন্টা বাঁধা কেন? তাই ভাবছিলাম—থেমে-থেমে, কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত হুঁ-ঠাং শব্দ হচ্ছে কেন?

ফোশল্ভাঁ জবাব দেয়,—ঘন্টা তো বাঁধতেই হয় ফাদার মাদলেন। এই ঘন্টার শব্দ শুনে উনারা বুঝতে পারেন যে, আমি ওখানটায় রয়েছি। এ হলো স্ত্রীলোকের রাজ্য। পুরুষদের তাদের চোখে পড়া নিষেধ। ঘন্টার শব্দ শুনে ওরা সরে যেতে পারেন।

ভালজাঁ কিছু বুঝতে পারছিলেন না কি বলছে ফোশল্ভাঁ! তাই জিজ্ঞেস করলেন,—ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না ভাই। এখানে কারা থাকেন?

ফোশল্ভাঁ অবাক হয়। বলে,—সে কি ফাদার মাদলেন। আপনি জানান না, এখানে কারা থাকেন?

—ধরে নাও আমি জানি না! আর জানার কথাও নয়।

ফোশল্ভাঁ বলে,—এই বুড়ো আমার মতো কতলোক আপনার দয়া পেয়েছে! আমার কথা কি আর আপনার মনে আছে! আমি কিন্তু সব সময় আপনার কথা মনে করি।

ভালজাঁ বললেন,—কিন্তু এটা কার বাড়ি?

—সে কি ফাদার মাদলেন! এই তো সেই কুমারী আশ্রম। আপনিই তো আমাকে এখানে মালীর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার সে যাক, আপনি এখানে এলেন কি করে? এখানে তো পুরুষেরা আসতে পারে না।

—তোমার কাছেই এসেছি ফোশল্ভাঁ। তুমি তো রয়েছ। ভালজাঁ জবাব দেন।

—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, ফোশল্ভা। আমি তোমার এখানে থাকতে চাই। ভালজা বলেন।

ফোশল্ভা ঠিক ভেবে পায় না ভালজা কি বলতে চাইছেন। সে আমতা-আমতা করে বলে,—আপনি আমার এখানে থাকতে চান ফাদার মাদলেন ? কিন্তু—এখানে যে পুরুষদের থাকার নিয়ম নেই। আপনি কি করে থাকবেন। আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভালজা এবার ফোশল্ভার হাত দুটো চেপে ধরে বলেন,—আমি তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছি। তাই ফোশল্ভা, আমি আজ বড় বিপদে পড়েছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। একদিন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম। তার কোন প্রতিদান হিসেবে নয়, আমি আজ তোমার সাহায্য চাই।

বৃদ্ধ ফোশল্ভা বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে গেলো। ফাদার মাদলেন তার হাত ধরে সাহায্য চাইছেন, এটা যে তার কল্পনার অতীত। করুণায় আর সমবেদনায় তার সারা মন ভরে উঠলো। ভালজার হাতের মুঠোয় বন্দী তার হাত দুটো। ভালজার হৃদয়ের আকৃতি যেন সে ঐ হাতের ভাষায় অনুভব করলো। ফোশল্ভা বললো,—ফাদার মাদলেন! আপনি আমাকে আদেশ করুন। বলুন আমাকে কি করতে হবে ? জীবন দিয়ে প্রয়োজন হলেও আমি সে আদেশ পালন করবো। আপনার কোন কাজে আসতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। ফাদার মাদলেন আদেশ করুন আমাকে।

ফোশল্ভার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভালজা। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত! তারপর বললেন,—তুমি সত্যি বলেছো ফোশল্ভা! শুধু আমি নই, আমার সাথে একটি কচি মেয়েও রয়েছে। আমাদের তুমি সাহায্য করবে ?

ফোশল্ভা বললো,—সত্যি ফাদার মাদলেন, সত্যি বলছি, আপনার দয়ার ঋণ কি আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো। আপনি বলুন, আমায় কি করতে হবে ?

—ফোশল্ভা, তুমি এখানে কোথায় থাকো ?

—ওই ভাসাবাড়ির পিছনে ছোট একটি ঘরে। ফোশল্ভা জবাব দেয়।

—ক'টি কামরা তোমার ?

—তিনটি কামরা নিয়ে আমার সংসার।

ভালজা বললেন,—আমার দুটো শর্ত রয়েছে ফোশল্ভা। আমি কেন তোমাদের এখানে এলাম, কি করে এলাম তা আমায় জিজ্ঞেস করতে পারবে না; কোন কৌতূহল দেখাবে না। আর আমার সম্পর্কে তুমি যা জানো, কাউকে কোনদিন বলবে না। বলা তাই ফোশল্ভা ? প্রতিজ্ঞা কর আমার অনুরোধের কোনদিন অন্যথা হবে না ?

ফোশল্ভা বললো,—আমি কথা দিলাম, আমি জানি ফাদার মাদলেন কোনদিন কোন অন্যায় করতে পারে না। কোন ষড়যন্ত্র তাঁর মনে নেই, নেই কোন অসৎ উদ্দেশ্য।

ভালজা বললেন,—আমাকে তুমি বাঁচালে তাই। তোমার এই দয়া আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমার সেই তিনটি ঘরের একটিতে আমার ও আমার মেয়ের জায়গা হবে ? তুমি থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে ? আমি এখন থেকে তোমার এখানে থাকতে চাই।

ফোশল্ভা বললো,—হ্যাঁ! হ্যাঁ ফাদার মাদলেন, এখন থেকে আপনি এখানেই থাকবেন।

ভালজা বললেন,—তাহলে চলো তাই, আমার মেয়েটিকে নিয়ে আসি। ওর জন্যে এখন একটি বিছানা ও একটু আশুন দরকার, নইলে ও মারা যাবে।

ফোশল্ভা বললো,—চলুন।

কুমারী আশ্রমে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করলেন ভালজা। ফোশল্ভা আশ্রমের প্রধান কুমারীর কাছে ভালজাকে নিজের ছোটভাই বলে পরিচয় দিলেন এবং তাঁকে কাছে রাখার অনুমতি চাইলেন। দীর্ঘদিন আশ্রমে কাজ করছে ফোশল্ভা! বয়সে বৃদ্ধ হলেও কাজে তার কখনো উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। কোনকাজে সে ফাঁকি দিয়েছে এ অপবাদ কেউ তাঁকে দেবে না। বিশ্বস্ততার সাথে সে কাজ করে আসছে। ফোশল্ভার আদার তাই প্রধান কুমারী মঞ্জুর করলেন।

আশ্রমের কাজে বেরোনের সময় ভালজা ফোশল্ভার মতো পায়ে ঘন্টা বাঁধা শুরু করলেন। দিনে কিছুক্ষণ তিনি আশ্রমের কাজ করেন। তেমন কিছু নয়, শুধু বাগানের তদারকি করা। তাঁর হাতে পড়ে বাগানের চেহারা বদলে গেলো। বাকী সময় ভালজা আশ্রমের মধ্যেই কাটাড়েন। বাইরে তিনি বেরোতেন না। ভয় ছিল, জাডেয়ার বোধহয় এখনো হাল ছাড়েনি। আশেপাশে কোথাও হয়তো সে ওঁত পেতে রয়েছে।

এদিকে কোজ্জতকে আশ্রমের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। ভালজার কাছে সে প্রতিদিন একঘন্টা করে থাকার অনুমতি পেল।

দেয়াল ঘেরা আশ্রম এখন ভালজার পৃথিবী। এই পৃথিবী থেকে বাইরের যে আকাশ দেখা যায়, তার দিকে মাঝে-মাঝে তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মন তাঁর ভখন কোন সুদূরে হারিয়ে যায় কে জানে। কোজ্জতও আশ্রমে এসে বাবাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করতে পারলো। চারদিকে যেন এক বিষণ্ণ পৃথিবী। আশ্রমের কুমারীরা সব সময় বিষণ্ণ থাকে। দুঃখ যেন তাঁদের চারপাশে। তাঁদের যেন খুশী হতে নেই, এমনি এক পরিবেশ। এদিকে বাবাও বাইরে বেরোন না। কাকা বুড়ো ফোশল্ভা এ-কাজে সে-কাজে বাইরে যাওয়া আসা করেন। বাবা মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। কিন্তু তবুও তার মন শান্ত। প্রতিদিন বাবা তাকে যে সময়টুকু কাছে পান, ততক্ষণ আনন্দ আর আদরে ভরিয়ে রাখেন। কোজ্জত তার বাবার সাথে আশ্রমের কুমারীদের তুলনা করে। বাবাকে সে যতই নিবিড় করে দেখেন, ততই তার শিশুমন বাবার প্রতি অপরিণীম শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে।

দেখতে-দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। বুড়ো ফোশল্ভা একদিন মারা গেল। তার মৃত্যুর পর ভালজা আবার ভাবনায় পড়লেন। এবার তিনি কি করবেন ? আশ্রমেই থাকবেন, নাকি চলে যাবেন ? অনেক চিন্তা ভাবনার পর ভালজা ঠিক করলেন—আশ্রমে থাক। তার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তিনি কোজ্জতকে নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আশ্রমের কেউ তা জানতে পারলো না।

ভালজা প্যারিসে চলে এগেল। বাসা ভাড়া করলেন। মেয়ে কোজ্জতকে নিয়ে আবার শুরু হলো তাঁর নতুন জীবনের যাত্রা। এখন থেকে তাঁর নাম হলো, ফোশল্ভা।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। কেটে যায় বছর। কোজেত এখন আর ছোট মেয়ে নয়। কৈশোর তার পেরিয়েছে। আগের চেয়ে সে আরো অনেক সুন্দরী হয়েছে। জা ভালজা ওরফে কোশলতা নিজেও অনেক সময় অবাক হয়ে যান। তাঁর ছোট মা-মণি কোজেত আজ এত বড় হয়ে গেছে! ভালজা ভাবেন—দিন কি আর কারো জন্যে বসে থাকে! তাঁর জন্যেও নয়। নিঃসঙ্গ পথিকের মতো সেই কবে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন। দুঃখ-বেদনা আর চকিত সুখের নানা রংয়ের দিনগুলো পায়ে-পায়ে কতদূর চলে গেল; মাঝে-মাঝে ভাবতে বসেন ভালজা, কোজেতকে দেখে তখন তিনি অবাক বিষয়ে তাকিয়ে থাকেন। আপন মনে হাসেন কখনো। কখনও মুগ্ধ হন। কোজেতকে মানুষ করে তোলার, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তারপর এক সময় আবার মন উদাস হয়। মাঝে-মাঝে কোজেতের বিয়ে দেওয়ার কথাও মনে হয়। তখন মন আরো উদাস হয়। কোথায় যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কোজেতকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব মনে হয়। আবার ভাবেন তা' কি করে হয়। মেয়েকে একদিন বিয়ে দিতেই হবে।

একটি ব্যাপারে ভালজা আজকাল চিন্তিত ছিলেন। কোজেতের সাথে জনৈক ব্যারন পুত্রের আলাপ হয়েছে। অভিজাত ঘরের এই ছেলেটির সাথে কোজেতের পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। ছেলেটির নাম ম্যারিউস। বয়স বছর কুড়ি হবে। তার বাবার নাম ব্যারন পমেরার সি। প্যারিসের বিশিষ্ট অভিজাত মঁসিয়ে জিল্নরমার একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী হলো ম্যারিউস। ম্যারিউস মাতৃহীন। সে শিশুকাল থেকেই তার নানা-নানীর কাছে মানুষ।

ছেলেটি তাদের বাসায় প্রায়ই আসে। ভালজা প্রথমে কোজত ও ম্যারিউসের এই মেলামেশা তেমন পছন্দ করেন নি। তাঁর নয়ন মণি মা-মণি তাঁর কাছ থেকে চলে যাবে এ তিনি ভাবতেও পারছিলেন না। কিন্তু যেতে তো একদিন তাকে দিতেই হবে। তখন তাঁর মনে হলো—ম্যারিউস হলো ধনী অভিজাত ঘরের সন্তান। ব্যারন পুত্রের এই ভালবাসা যদি মোহ বা চোখের ঘোর হয়! এই মোহ কেটে গেলে সে যদি কোজেতকে পরিত্যাগ করে। এমন ভাবনায় দুঃখিল ভালজার মন। কিন্তু এর মাঝেই তিনি আবিষ্কার করেছেন তাদের এই ব্যাপারটা তিনি নিজেই কখন যেন প্রশ্ন দিয়েছেন। তখন বুদ্ধ ভাবেন তাইতো! এ যে তার মা-মণির মনের ব্যাপার—তার হৃদয়ের মণির আনন্দের পসরা।

ম্যারিউস-এর মনেও খানিকটা শঙ্কা ছিল। তার নানা এ বিয়েতে সম্মতি দেবেন তো? যদি না দেন তবে কী হবে? ম্যারিউস তাও ভেবে রেখেছিলেন। তবুও কোজেতকে সে ছাড়তে পারবে না।

দেখতে-দেখতে ১৮৩২ সালের সেই স্বর্ণীয় জুন মাস এলো। চারদিকে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। রাজ সৈন্যের সাথে চলছে এখানে-সেখানে বিদ্রোহীদের খণ্ড যুদ্ধ। জনগণের জমাগত অধিকার দিতে হবে। তাদেরকে জীবনের সার্বিক আলোকের, উন্নতির সুযোগ দিতে হবে। চারদিকে বিদ্রোহের বঙ্ক ঘোষণা—সাধারণতন্ত্র কায়েম হোক, সাধারণতন্ত্র জিন্দাবাদ।

চারদিকে জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন রাজ সৈন্যের সাথে বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে বহু লোক হচ্ছে হতাহত। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে একদিন ম্যারিউস তার নানার কাছে বিয়ের কথাটা তুললো।

মঁসিয়ে জিল্নরমা বললেন,—বিয়ে করবে তাতো আমার জন্যে খুবই সুখের কথা! আহা-হা আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতো। সবই অদৃষ্টের খেলা। তা হোক, আমরা তাহলে এবার পাত্রী দেখি তোমার, কি বলো?

ম্যারিউস কিছুটা ইতস্ততঃ করলো। তারপর বললো,—মেয়ে আমার ঠিক করা আছে নানাভাই। আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা আপনাকে বলবো-বলবো ভাবছিলাম।

মঁসিয়ে জিল্নরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে ম্যারিউসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিতে তার বিষয় ফুটে উঠলো।

তিনি বললেন,—ঠিক বুঝতে পারলাম না ম্যারিউস কি বলছে তুমি?

ম্যারিউস জবাব দিল,—মেয়ে আমার ঠিক করা আছে নানাভাই। তার নাম কোজেত। খুবই ভালো মেয়ে। আপনাদের কারোই অপছন্দ হবে না। গত কয়েক বছর যাবৎ তারা এই শহরে বাস করছে। বাবার নাম মঁসিয়ে কোশলতা। খুবই নিরীহ আর সম্ভ্রান্ত পরিবার। আমি অনেক ভেবে দেখেছি নানাভাই। এ মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে চাই। আপনারা অনুমতি দিন।

—মেয়ে সুশীলা এবং সাথে-সাথে সুন্দরীও বটে, তাই নয় ম্যারিউস? কিন্তু মেয়ের আর সব খবর জানাও আমাকে। মেয়ের বাবা কি করেন? বংশ, তাদের পরিবার এ সব খবর নিয়েছো? মঁসিয়ে জিল্নরমার কণ্ঠে এবার স্পষ্ট ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ।

কোশলতা ও কোজেত সম্পর্কে ম্যারিউস যা জানে জানালো। মঁসিয়ে জিল্নরমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন,—ম্যারিউস! তুমি কার দৌহিত্র, আর কাদের সম্পত্তির তুমি উত্তরাধিকারী, তার বংশ পরিচয় কি তা' জান? বুদ্ধ জিল্নরমার কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপছে।

ম্যারিউস ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়,—জানি নানাভাই।

মঁসিয়ে জিল্নরমা বললেন,—তাই যদি জানো তবে এ বিয়ের কথা তুমি কি করে বললে? আমি বলে দিছি ম্যারিউস এ বিয়ে হবে না, হতে পারে না। আর হ্যাঁ! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখে কালি দিয়ে তুমি যদি এখানে বিয়ে করো, তাহলে আমি তোমাকে ভাগ করতে বাধ্য হবো।

মঁসিয়ে জিল্নরমা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। তারপর আবার বললেন,—আমি বিম্বিত হয়েছি ম্যারিউস। শেষে তুমিও আমার মান-ইজ্জত, আমার পারিবারিক অভিজাত্যে কলঙ্ক লাগাতে উদ্যত হয়েছো।

ম্যারিউস হয়তো এতটা আশা করেনি। সে মঁসিয়ে জিল্নরমাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলো। মঁসিয়ে সব কথা শুধু শুনেই যেতে লাগলেন। উত্তেজনাকে তখন তিনি খানিকটা সামলে নিয়েছেন। ম্যারিউসের সব কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ

চুপ করে রইলেন, তারপর হেসে বললেন,—এ বিয়ে হতে পারে না ম্যারিউস নানাভাই আমার।

ম্যারিউস আবার বুঝালো। মঁসিয়ে জিল্লনরমা এবারও হাসতে-হাসতে বললেন,—তুমি এখনো নিতান্ত ছেলমানুষ ম্যারিউস! আমার এবার একানব্বই বছর বয়স হলো। মাথার চুল শুধু-শুধু ধুলো হাওয়ায় পাকেনি। পৃথিবীর অনেক কিছুই তুমি জানো না। আসলে তুমি একটি মূর্খ। কোথাকার কোন মেয়ে, তেমন ভালো বংশ পরিচয় নেই। তোমার মতো বংশজাত একটি ছেলে হাতে পেলে তাদের তো স্বর্গপ্রাপ্তি। তুমি আমাকে আগে বললেও আগেই আমি তোমার ভুল ভাসিয়ে দিতাম। যাকগে, এ মেয়ের ধান্না তুমি ছেড়ে দাও।

ম্যারিউস এবার উঠে দাঁড়ালো। আর নয়, অনেক অপমান সে এতক্ষণ সহ্য করেছে! সে সোজা ঘরের দরোজার দিকে এগিয়ে গেল।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা জিজ্ঞেস করলেন,—কোথায় যাচ্ছে, ম্যারিউস?

ম্যারিউস এ কথাই কোন জবাব দিল না। মঁসিয়ে জিল্লনরমার দিকে ফিরে মাথা নুইয়ে সে সালাম করলো। বললো,—আপনার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ নানাভাই। কিন্তু অভিজাত্যের অহঙ্কারে আজ আপনি আমাকে অপমান করলেন। আমার বাবাকেও আপনি এই অভিজাত্যের দণ্ডে পাঁচ বছর আগে অপমান করেছিলেন। আপনি অভিজাত অথচ লোকজনকে যাচ্ছে-তাই অপমান করতেও আপনার কুণ্ঠা নেই। ভালোই হলো নানাভাই। আপনার আচরণ আমার চিরদিন মনে থাকবে। আজ থেকে আপনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার সম্পত্তি আর টাকা-পয়সারও আমি কান্দাল নই। আশীর্বাদ করুন নানাভাই—বলে গটগট করে ম্যারিউস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা শুভিতের মত বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। কী কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু তার যেন বাকশক্তি নেই। গায়ে যেন তিনি বল পাচ্ছেন না। কি বললো, কোথায় চলে গেল ম্যারিউস? সে কি চীরদিনের মতো তাদেরকে ছেড়ে গেল? তাহলে তিনি কাকে নিয়ে বাঁচবেন? ম্যারিউস যে তার চোখের মণি। মাতৃহীন শিশুকে কোলে পিঠে করে এতদিন তিনি মানুষ করেছেন। একদিন তাকে বাড়ির কর্তা করে চোখ বন্ধ করতেন এই আশা তিনি করতেন! আর আজ সে অতিমান করে চলে গেল। আচ্ছা, তিনি কি কোন কঠিন কথা বলেছিলেন?

কয়েক মুহূর্ত আশ্চর্যের মত কেটে গেল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—কে কোথায় আছে? বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে।

বাড়ির লোকজন ছুটে এলো। মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—বাঁচাও আমাকে তোমরা বাঁচাও! ম্যারিউস রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে আর ফিরে আসবে না। তোমরা ওকে ফিরিয়ে আনো। একবার ও চলে গেলে ওকে আর ফিরাতে পারবে না। যাও—দৌড়ে যাও। ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো, শিশু যাও।

বাড়ির লোকজন হস্তভঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কি বলছে মঁসিয়ে জিল্লনরমা!

মঁসিয়ে তখন জানালার দিকে ছুটে গেলেন। রাস্তার দিকে মুখ ঝুকিয়ে তিনি ডাকছেন,—ম্যারিউস। ফিরে আয় ম্যারিউস। আমার চোখের মণি।

কিন্তু ম্যারিউস সে ডাক শুনতে পেলনা। সে তখন বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

ম্যারিউস বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল! তাঁর নানাভাই মঁসিয়ে জিল্লনরমা হলেন রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সাধারণতন্ত্রের জন্যে জনগণের সংগ্রাম ও বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ছিল জমাট বাঁধা। সেই মঁসিয়ে জিল্লনরমার দৌহিত্র ম্যারিউস সংগ্রামের হাতিয়ার ভুলে নিল রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে।

সাত নম্বর হোমি আর্মির বাড়িতে বসে ফোশল্ভা ওরফে জাঁ ভালজাঁও এই খবর শুনলেন। চিন্তায় পড়লেন জাঁ ভালজাঁ। নানা রকম অশুভ চিন্তাই তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগলো—ইচ্ছে করে তাকেও বোধ করা সম্ভব নয়। তাঁর মা-মণি কোজেরের সাথে আজ যে নামটি জড়িত, তা হলো ম্যারিউস। সে ন্যাকি বিদ্রোহীদের ছোটখাট একটি দলের প্রধান। রাজসৈন্যের সাথে লড়াই করছে।

ঘরে বসে থাকতে পারলেন না ভালজাঁ। তাঁর মন কেবলই ছুটফুট করছে। তারপর একসময় ঘর থেকে বোরোলেন। ম্যারিউসরা যেখানে রাজসৈন্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে বলে শুনলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে সব কিছুই প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন।

এক সময় চমকে উঠলেন ভালজাঁ। এখানেও সে এসেছে। বিদ্রোহীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারা অসম্ভব উত্তেজিত। কিন্তু সে কি করতে এলো? সরকারী প্রয়োজনে না অন্য কোন কারণে? ইন্সপেক্টর জাভেররকে এখানে এভাবে দেখবেন ভাবেন নি ভালজাঁ।

খানিকক্ষণ কি যে ভাবলেন ভালজাঁ। তারপর এগিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর জাভেররের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা, কোমরেও দড়ির শক্ত বাঁধ। পায়েও বাঁধা রয়েছে। বিদ্রোহীদের জিজ্ঞেস করলেন ভালজাঁ,—কি হয়েছে?

—এ ব্যাটা সরকারী গুপ্তচর। আমাদের সামরিক বিচারে ওকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

—তোমাদের কাছে আমার একটি আবেদন আছে। ভালজাঁ বলেন।

বিদ্রোহীরা জবাব দেয়,—বলুন।

—আমি বুড়ো হয়েছি। আমি লড়াইয়ে যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু আমাকে তোমরা একটু সুযোগ দাও। এই গুপ্তচরকে তোমরা যে শাস্তি দিয়েছো আমাকে তা পালন করতে দাও। আমি নিজের হাতে একে সেই শাস্তি দিতে চাই।

ফোশল্ভা ম্যারিউসের ভাবী স্বস্তর, আর একথা বিদ্রোহীদের মাঝেও কেউ-কেউ জানতো। তিনি আবেদন জানিয়েছেন, তাতে অমতের কি আছে।

তারা রাজী হলো। বললো,—তাই হোক মঁসিয়ে ফোশল্ভা। গুপ্তচরবৃত্তির চরম শাস্তি আপনার হাত দিয়েই প্রদান করা হোক। আপনার হাতে একে আমরা ছেড়ে দিলাম।

ভালজাঁ ইন্সপেক্টর জাভেররকে বললেন,—চলো আমার সাথে। হাটতে-হাটতে ভালজাঁ কাছেই একটি গলির মধ্যে এক নির্জন কোণে ইন্সপেক্টরকে নিয়ে গেলো। ভালজাঁর হাতে একটি পিস্তল।

এতক্ষণে ভালজা বন্দীর সাথে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন,—ইসপেট্টর জাভেরর আমার চিনতে পেরেছ ?

জাভেরর তার সাধারণ দৃষ্টিতে ভালজার দিকে তাকাল। কুণ্ঠিত রেখাময় মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি চকিতে দেখা দিলো। নাকের পাশে চান্টা ভাঁজ পড়ে আবার মিলিয়ে গেল। সেই আগের মত হামবড়া ভাবে বললো,—চিনতে পারবো না কেন ? তুমি সেই দাণী আসামী জাঁ ভালজা।

জাভেরর আবার বললো,—তা চূপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন ? সুযোগ পেয়েছো, তার প্রতিশোধ নেবে না ? কণ্ঠে তার বানিকটা ব্যাপ।

জাভেররের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। হাসলে জাভেররকে বাঘের মত দেখায়। ঘন জু দু'টো আরো একটু নিচে ঝুলে পড়েছে। চোখ দু'টো পুরো দেখা যাচ্ছে না। জাভেররের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ভালজা, তারপর পকেট থেকে একটি ছুরি বের করলেন।

জাভেরর আবার বলে উঠলো,—এইতো দেখি আর একটি অস্ত্র বের করছো। ভালো, ভালো, এটাই তোমার জন্য ভালো। ছুরির ঘায়ে-ঘায়ে আমাকে খতম করে দাও। নাকি টুকরো-টুকরো করে কাটবে ?

ভালজা কোন জবাব দিলেন না। ছুরি দিয়ে জাভেররের হাত পা ও কোমরের বাঁধন কেটে দিলেন। জীবনে জাভেরর কোন ঘটনায় খুব বিপ্লিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সে এবার অঝো হয়ে ভালজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভালজা বললেন,—তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম ইসপেট্টর জাভেরর। তুমি মুক্ত। বিদ্রোহীরা কোন কিছু জানার আগেই এখান থেকে তুমি চলে যাও। ইসপেট্টর জাভেরর হা করে দাঁড়িয়ে রইলো। এসব কি স্বপ্ন! ভালজা তাকে কি বলছে! এমনি ঘটনা যে তার কাছে অবিদ্যাস্য, কল্পনার অতীত। এ হতেই পারে না।

ভালজা আবার বললেন,—ইসপেট্টর জাভেরর। হোমি আর্মির সাত নম্বর বাড়িতে আমি থাকি। মিথ্যে বলছি না। এটাই আমার বর্তমান ঠিকানা। এখান থেকে কখন কি ভাবে আমি বাসায় যাবো বলতে পারি না। তবে ওটাই আমার থাকার জায়গা। ওখানেই আমার খোজ পাবে। আরেকটি কথা, আমার বর্তমান নাম কোশল্জা। ও নামেই আমি এখন পরিচিত সর্বত্র।

বিশ্বয়ের ঘোরে ইসপেট্টর জাভেরর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভালজার কথা শুনে-শুনতে সে আবার সেই আগের প্রচণ্ড প্রতাপশালী ইসপেট্টর জাভেররে ফিরে গেছে।

ভালজার প্রতি সে হঠাৎ গর্জে উঠলো। বললো,—ইঁসিয়ার, ভালজা ইঁসিয়ার। কিন্তু সে গর্জন যেন আগের মতো কর্কশ কঠিন হলো না।

ভালজা বললেন,—এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা তোমার জন্যে মঙ্গল নয় ইসপেট্টর। যা করার তুমি পরে করো, এখন তুমি এখান থেকে পালাও।

জাভেরর তির্যক দৃষ্টিতে ভালজার দিকে তাকালো। কোটের বোতাম লাগাতে-লাগাতে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার বাসা যেন কোথায় বলেছিলে, সাত নম্বর হোমি আর্মি। তাই বললো না ?

জাভেরর ঠিকানাটি মনে-মনে কয়েকবার আওড়াল। তারপর আন্তে ধীরে গলি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতে না যেতেই সে আবার ফিরে এলো।

বললো,—ভালজা! আমার বড় অন্তর্ভুক্তি লাগছে। তোমার হাতে পিস্তল রয়েছে। তুমি সুযোগ পেয়েছ, প্রতিশোধ নাও। আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। কিন্তু তোমার দয়ায় আমার অশ্রুতি লাগছে ভালজা। মারো আমাকে, মেরে ফেলো।

জাভেররের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভালজা। আর জাভেরর অনুভব করতে পারছে, দাণী আসামী ভালজার সাথে সে যেন একটু সম্মান করেই কথা বলছে।

ভালজা বললেন,—ইসপেট্টর জাভেরর! আমার ঠিকানা দিয়েছি। তুমি এখনকার মতো এখান থেকে চলে যাও। প্রয়োজন হলে অন্য সময় এসো। এটা দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়।

আকাশের দিকে পিস্তল উঠিয়ে ভালজা দু'বার শূন্য গুলী ছুঁড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে গলি থেকে বেরিয়ে গেলেন! বিদ্রোহীদের কাছে গিয়ে ভালজা বললেন যে, কাজ শেষ হয়েছে।

এদিকে ইসপেট্টর জাভেরর বিষয়ে নিষ্পন্দের মতো ভালজার দিকে তাকিয়ে রইলো। আপন মনেই বললো,—এ কি মানুষ, না ফেরেশতা! একে আমি এতদিন কত নির্ধাতন করে আসছি! আমি তাহলে কতো নীচ! মৃত্যুই আমার শেষ!

রাজসৈন্যের সাথে লড়াইয়ে আহত হলো ম্যারিউস। গুলীর আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একটি গুলী ম্যারিউসের পাজরের পাশ দিয়ে চলে গেছে ? এছাড়া, কাঁধে গুরুতর আঘাত লেগেছে। হাতে লেগেছে তলোয়ারের ঘা।

সেদিনের লড়াইয়ে ম্যারিউসদের বিদ্রোহী দল রাজসৈন্যের সাথে পরাজিত হলো। বিদ্রোহীরা তখন লড়াই-এর এলাকা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে, রাজসৈন্যেরা তাদের ধাওয়া করছে, বিদ্রোহীদের প্রতি গুলী ছুঁড়ছে, বিদ্রোহীদের প্রহার করছে। পুরো এলাকায় তখন গুরু হয়েছিল রাজসৈন্যের তাণ্ডব, শোনা যাচ্ছে তাদের মন্ত হাহাকার আর সাথে শোনা যাচ্ছে আহতদের করুণ আর্তনাদ।

কোন মুহূর্তে কি ঘটে বলা যায় না। লড়াইর ময়দানে আহত অবস্থায় ম্যারিউস পড়ে রয়েছে। রাজসৈন্যেরা পলায়নপর অথবা সুস্থ বিদ্রোহীদের তাড়ানো ও মোকাবিলায় তখনো ব্যস্ত। এরপরই আহতদের দিকে তাদের নজর পড়বে। ভালজা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, এক্ষণি ম্যারিউসকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু এই ভীড় ও হানাহানির মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে আসা যে অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু জাঁ ভালজা তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবেই। এর সাথে যে মা-মণি কোজেরের জীবন মরণ জড়িত। চারবার জেল থেকে পালিয়েছেন ভালজা। তারপর ভালজাকে পালিয়েই বেড়াতে হচ্ছে। এবারও কি তিনি পালিয়ে যেতে পারবেন না ম্যারিউসকে নিয়ে ? ম্যারিউসকে তিনি কাঁধে তুলে নিলেন।

ম্যারিউস যেখানে আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার অদূরে এককোণে রাস্তার উপরে ড্রেনের একটি মুখ। ড্রেনের এসব মুখ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নিচে নেমে সুইপাররা তা পরিষ্কার করে। ড্রেনের মুখটিতে স্বাক্ষরিত ঢাকনা। চারদিকে তাকাতে-তাকাতে

ভালজাঁর হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়লো। খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর ওদিকে এগিয়ে গেলেন! ড্রেনের ঢাকনা তিনি দ্রুতহাতে খুলে ফেললেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে চট করে ড্রেনের সেই সুড়ঙ্গপথে তিনি নেমে গেলেন। কাঁধের উপরে ম্যারিউস। চারদিকে তখন এক প্রলয়ের অটরোল। রাজসৈন্যরা বুনা উল্লাসে ধাওয়া করছে বিদ্রোহীদের। এলাকার চারদিকে তখন তারা তাদের ঘাঁটি জোরদার করেছে। এমনি পরিস্থিতিতে লোকের চোখ বাঁচিয়ে জীবনের দারুণ এক ঝুঁকি নিয়ে ড্রেনের সুড়ঙ্গে নেমে পড়লেন ভালজাঁ।

অন্ধকার শুধুই অন্ধকার! সূর্য অস্ত গেছে। বাইরে তখন সন্ধ্যা পড়িয়ে নেমেছে রাত। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ড্রেনের সেই বন্ধ পরিবেশে বাইরের পৃথিবীর আলোর রেশটুকুও নেই। চারদিকে থম্‌থমে অন্ধকার। দুর্গন্ধে ভরা পরিবেশ, হাঁটু থেকে কোমর সমান নোংরা পানি! কোন দিকে যাবেন ভালজাঁ?

পা দিয়ে ড্রেনের তলদেশকে ভালজাঁ অনুভব করার চেষ্টা করলেন। নর্দমাটি যেদিকে ঢালু সেদিকে তিনি এগিয়ে যাবেন। এই পানি নদীতে গড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ঢালু পথে এগিয়ে গেলে তিনিও হয়তো নদীর মুখে পৌঁছে যেতে পারবেন।

ঢালু পথের দিকে আঁধারে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চললেন ভালজাঁ! সময় যেন এগুতে চায় না! কেউ যেন ফিস-ফিস করে কানে-কানে বলছে,— আর কতদূর ভালজাঁ! কাঁধের উপর অচৈতন্য ম্যারিউসের দেহের ভারে তিনি ক্লান্ত। দুশ্চিন্তায় দপ-দপ করছে মাথার শিরা-উপশিরা।

চলতে-চলতে ম্যারিউসের দেহকে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে নিলেন ভালজাঁ! খানিকক্ষণ আবার ও-কাঁধ থেকে এ-কাঁধে। এমনি করে চলতে লাগলেন। কতক্ষণ চলেছেন খেয়াল নেই ভালজাঁর। হয়তো আধঘণ্টাখানেক। কিন্তু মনে হয় যেন কত যুগ ধরে তিনি এই বন্ধুর পথ হেঁটে চলছেন।

কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই নোংরা পথ! নাকি পথ আমি ভুল করে চলেছি! ম্যারিউসকে কি বাঁচানো যাবে! এসব ভাবলেন ভালজাঁর মনে। এসময় দূরে এক ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। আশা-আনন্দে ভালজাঁর মন মেতে উঠলো। তাহলে তিনি ঠিক পথেই এসেছেন। আরেকটু পরেই পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্পর্শ পাবেন হয়তো।

আলোর রেখাটি আস্তে-আস্তে আরো বড় হতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে ভালজাঁ আলোর বুকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন। ড্রেনের মুখে তিনি এসে পড়েছেন। কিন্তু একি ড্রেনের মুখের ঝাঁজরিটি একটি প্রকাণ্ড তালি দিয়ে আটকানো। তাহলে—তাহলে এবার কি এই ড্রেনের মধ্যেই তাকে পঁচে মরতে হবে!

সুড়ঙ্গের চারপাশে ঝাঁজরির ধারে যেখানটায় পানি তেমন নেই, সেখানে ম্যারিউসকে শুইয়ে দিলেন ভালজাঁ। তারপর ঝাঁজরির দরজাটি গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে তুললেন। এমনিভাবে ধাক্কা দিয়ে দরোজার তালি খুলে বা ভেঙ্গে ফেলা যে সম্ভব নয়, ভালজাঁ তা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু তালি যে তাঁকে ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। তাকে এই নরক থেকে মুক্তি পেতেই হবে! ভালজাঁ ছোটখাট কিছু অস্ত্র সব সময়ই

নিজের কাছে রাখতেন। তাঁর জামা বা কোটের পকেটে সেগুলো থাকে। বহুবার এসব অস্ত্রের সাহায্যে তিনি পালিয়ে যেতে পেরেছেন! এগুলো কাছে থাকলে তালি ভেঙ্গে ফেলা তেমন সমস্যা হতো না, কিন্তু আজ ঝড়াইয়ের ময়দানে আসার সময় ওগুলো তিনি আনেননি। ম্যারিউসের পকেট হাতড়ে দেখলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু না কিছুই নেই। ম্যারিউসের জামার পকেট থেকে পাওয়া গেল একটি পকেট বই, কয়েকটি টাকা এবং একটি রুটি।

ভালজাঁ আবার প্রাণপণে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না। শ্রান্ত-অবসন্ন ভালজাঁ ম্যারিউসের পাশে বসে পড়লেন। সারা শরীর দিয়ে দর-দর করে ঘাম ঝরছে। সারা গায়ে লেগেছে ড্রেনের যতসব ময়লা। বাইরে চাঁদের আলো, ঝাঁজরির ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলোও ড্রেনের মুখে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

ম্যারিউসের পকেটে যে রুটিখানা পেয়েছিলেন, ভালজাঁ তা খেয়ে ফেললেন। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে তাঁর। তারপর ম্যারিউসকে কাঁধে তুলে আবার পা টিপে-টিপে ড্রেনের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন ভালজাঁ।

পথের কি শেষ নেই! আর কত দূর! চারধারে অন্ধকার—থকথকে অন্ধকার। নিচে নোংরা পানি, চারধারে দুর্গন্ধময় পরিবেশ। কাঁধের উপর নিখর দেহ। আর বুকি পারছেন না ভালজাঁ। মনে হচ্ছিল, হোক না নোংরা পানি, হোক না অন্ধকারাচ্ছন্ন ড্রেন, তবু যদি তিনি একটু শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে পারতেন! মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, এই বুকি পা টলে পড়ে যাবেন। কিন্তু সাথে-সাথেই মনের সেই আচ্ছন্ন ভাবকে ঝেড়ে ফেলছেন ভালজাঁ। অবিচল স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পথের সন্ধান তাঁকে পেতেই হবে। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

চলতে-চলতে এক সময় আবার আলোর রেখা দেখতে পেলেন ভালজাঁ। আশা ও আনন্দে তিনি আবার উন্মুখ হয়ে উঠলেন। মনে-মনে বললেন,—ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। পথের দিশা তাকে যে পেতেই হবে।

আলোর রেখাটি ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হতে লাগলো। তারপর ভালজাঁ এক সময় ড্রেনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। ড্রেনটি ওখানে যেন নদীর সাথে ঢালু হয়ে মিশে গেছে। ভালজাঁ ড্রেন থেকে বেরিয়ে এলেন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর অচৈতন্য ম্যারিউসকে শুইয়ে দিলেন ভালজাঁ। তিনি নিজেও আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন! কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভালজাঁ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর কাজ তো এখনো শেষ হয়নি। ম্যারিউসকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি এনে ম্যারিউসের চোখে-মুখে ঝাঁপটা দিতে লাগলেন।

নাড়ী পরীক্ষা করলেন ভালজাঁ! ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে ম্যারিউসের। নদী থেকে আঁজলা ভরে আবার পানি তুলতে লাগলেন ভালজাঁ।

এমন সময় কাঁধের উপর একটি হাত পড়লো। ভালজাঁ ঘাড় ফেরালেন।

—কে তুমি? এ রাতের বেলা এখানে কি করছ? কর্কশ কণ্ঠে লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

—আমায় চিনতে পারছো না ইসপেট্টর জাভের! আমি জাঁ ভালজাঁ। ইসপেট্টর জাভের চমকে ওঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ভালজাঁর মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ সে ভালজাঁর কাঁধ আরো সজোরে আঁকড়ে ধরে।

ভালজাঁ বললেন,—ভয় নেই ইসপেট্টর, আমি পালিয়ে যাবো না। আমি তো তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছি! পালাবার ইচ্ছে থাকলে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম, তা' তুমি জানো ইসপেট্টর। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে রয়েছি। আমার বাড়ির ঠিকানাও দিয়েছি। তোমার হাতেই আমি বন্দী ইসপেট্টর। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষে চাইবার রয়েছে।

কাঁধের উপর জাভেরের হাত শিথিল হয়ে এলো। ভালজাঁর চোখের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মনের মধ্যে তার চিন্তার ঝড়। এমনি অবস্থায় বোধহয় সে জীবনে আর কোনদিন পড়েনি! বিড়বিড় করে সে বলে উঠলো,—হ্যাঁ, তুমিই জাঁ ভালজাঁ। কিন্তু তোমার এ কি চেহারা হয়েছে! সারা গায়ে কাদা! এত নোংরা! আর এ লোকটি তোমার কে?

ভালজাঁ বললেন,—আমি ওই ড্রেনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছি। সবার চোখের আড়ালে-আড়ালে থেকে আমাকে আসতে হয়েছে।

—কিন্তু এই লোকটিকে তুমি কোথায় পেলো? জাভের জিজ্ঞেস করে।

—একে নিয়েই আমি ড্রেন পেরিয়ে এসেছি। এর ব্যাপারেই আমি তোমার কাছে খানিকটা সময় ভিক্ষা চাইছি ইসপেট্টর। একে বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময়টুকু আমাকে দাও। এর বাড়ি ৬নং রুয় দ্যা কীল দ্যা কালভের। এ মিসিয়ে জিল্নরমার নাতী।

জাভের চূপ করে রইলো। মনে হলো, তার মনের চিন্তার ঝড় এখনো শেষ হয়নি। স্বভাবগতভাবে সে নিয়মভঙ্গকে মনে করে দারুণ অপরাধ, নিয়মের কাছে দয়া-ধর্ম তার নিকট কোনদিন ঠাই পায়নি। সে কাউকে বিশ্বাস করে না, কোন কিছু সে ভুলে যায় না, মূলতঃ কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। অপরাধীকে ধরার জন্য সে নির্মম হৃদয়ে অপেক্ষা করে। দোষীকে ধরিয়ে দেওয়ার কাজে নিষ্ঠুরতম পস্থা গ্রহণও তার আপত্তি নেই। বিদ্রোহীদের প্রতি রয়েছে তার চরম বিদ্বেষ, শাসকদের আদেশের প্রতি রয়েছে পরম আনুগত্য। কিন্তু আজ সকাল থেকে যে চিন্তার ঝড় তার চিন্তকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল, তা যেন এখন আবার উজ্জল সমুদ্র হয়ে উঠেছে। তবুও সে ঝড়কে গা-ঝাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে আগের সেই জাভেরের ফিরে যেতে চাচ্ছিল।

নিচু হয়ে সে আহতের মুখ ভাল করে দেখে বললেন,—এই লোকটিকে তো আজ বিদ্রোহীদের দলে দেখেছি। এর নাম ম্যারিউস। ঠিক বলেছি না?

ভালজাঁ জবাব দিলেন,—হ্যাঁ।

জাভের এবার ম্যারিউসের নাজী পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর বললো,—একে নিয়ে কোথায় যাবে জাঁ ভালজাঁ?

ভালজাঁ বললেন,—ঐ অলক্ষণে কথা দয়া করে আর বলবে না ইসপেট্টর। এ ভয়ানকভাবে আহত হয়েছে। চেষ্টা করলে এখনো হয়তো একে বাঁচানো যাবে।

জাভের আবার বললো,—তুমি বলছো আহত আর আমি তো দেখছি মারা গেছে।

ভালজাঁ এবার উচ্চ কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বললেন,—মিথ্যে কথা বলো না ইসপেট্টর জাভের। আমি বলছি ম্যারিউস এখনো মরেনি। আমি তো তোমার কাছে খানিকটা সময় ভিক্ষা চেয়েছিলাম।

ভালজাঁর কথায় আবার ঝড় উঠলো জাভেরের মনে, আবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত।

দূরে একটি ভাড়াটে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। জাভের ডাকলো,—এই গাড়ী ভাড়া যাবে? এদিকে এসো।

রাস্তা তখন মধ্যপ্রহর পেরিয়ে গেছে। আহত ম্যারিউস, ভালজাঁ ও জাভেরকে নিয়ে গাড়ী এসে মিসিয়ে জিল্নরমার বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াল। জাভের গাড়ী থেকে নেমে গেইটের কড়া নাড়ল। জোরে-জোরে কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দারোয়ান এসে দরোজা খুললো।

দরোজা সামান্য ফাঁক করে বাতি তুলে জিজ্ঞেস করলো,—আপনারা কে? কি চাই?

জাভের বললো,—এটা তো মিসিয়ে জিল্নরমার বাড়ি? তাকে গিয়ে খবর দাও যে, আমরা তার নাতীকে নিয়ে এসেছি। রাজসৈন্যের সাথে যুদ্ধে সে মারা গেছে।

দারোয়ান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ইতোমধ্যে জাভের দরোজাটি ঠেলে আরো খানিকটা ফাঁক করেছে। জাভেরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ভালজাঁ, তাঁর গায়ে রক্ত ও কাদা মাখা ছেড়া জামা, কিন্তু-কিমাকার চেহারা। সে দারোয়ানকে ইঙ্গিতে বোঝালো যে, ম্যারিউস বেঁচে আছে। দারোয়ান কি বুঝলো, কে জানে! চাকর-বাকরদের সে ভাকাভাকি শুরু করলো। ম্যারিউসের নাতী মাদাম জিল্নরমাও খবর পেলেন। মিসিয়ে জিল্নরমাকে কেউ সাহস করে খবর দিচ্ছিল না। গাড়ী থেকে ম্যারিউসকে চাকর-বাকরেরা সবাই ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

ম্যারিউসকে উপরের একটি ঘরে নিয়ে গুইয়ে দেয়া হলো। পিছু-পিছু ভালজাঁও উপরে চলে এলেন। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে। ঘরের মধ্যে ফিস-ফিস করে এ ওর সাথে আলোচনা করছে। মিসিয়ে জিল্নরমা তখনো খবর পাননি। ভালজাঁ হির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ম্যারিউসের দিকে। সে দৃষ্টি যেন ম্যারিউসকে ছাড়িয়ে কোন সুদূরে ডানা মেলেছে। ভালজাঁর দু'চোখে যেন ছায়া ফেলেছে স্থতির পানিরা।

এমনি সময় কাঁধে আলতো ছোঁয়া পেয়ে ভালজাঁ চমকে উঠলেন। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখেন ইসপেট্টর জাভের। ইসপেট্টর কোন কথা বলল না। শুধু ভালজাঁর দিকে শীতল দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিচে নামবার জন্য পা বাড়ালো। ভালজাঁও তাকে অনুসরণ করলেন। এখানকার কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। ইসপেট্টরের কাছে তিনি সময় চেয়েছিলেন। এবার যেতে হবে।

গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমনি সময়ে ভালজাঁ ইসপেট্টর জাভেরকে বললেন,—তোমার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ইসপেট্টর। ম্যারিউসকে বাড়ি রেখে আসার সময় চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে সেই সময় দিয়েছো। তোমার কাছে আরেকটি ভিক্ষা

চাইছি। এতই যখন করলে, আমাকে এ দয়াটুকু তুমি করো ইসপেটর। আমাকে একটু বাড়ি নিয়ে চলো। বেশী দেরি করবো না, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে বাড়ি যেতে দাও। মা-মণির সাথে একবার একটু কথা বলার সুযোগ ও সময় তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি।

চিন্তার ঝড়ে হাওয়ার মতন আবার জাভেয়রের চেহারা প্রকট হয়ে উঠলো। খানিক পর সে ভালজাঁকে বললো,—গাড়ীতে ওঠো। হোমি আর্চি লেন চলো, বললো গাড়োয়ানকে। তারপর সে নিজে গাড়ীতে উঠে চূপ করে ওপাশের আসনে বসে রইলো। গাড়ী যখন চলতে শুরু করেছে তখন দেখা গেল দু'জনেই চূপ করে বসে কি যেন ভাবছে।

হোমি আর্চি লেনের মুখে এসে গাড়োয়ান হাঁক দিলো,—আপনারা কোথায় নামবেন হুজুর? গাড়ী তো গলির ভেতরে চুকবে না।

জাভেয়র ভালজাঁর দিকে তাকালেন। ভালজাঁ বললেন,—গলির মধ্যে খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে।

গাড়ী থেকে নেমে জাভেয়র গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিলো। তারপর ভালজাঁকে বললো,—সাত নম্বরের বাড়িতে থাকো, তাই না? চলো।

সাত নম্বর বাড়ির পেটে এসে ভালজাঁ বললো,—আমি এই বাড়িতে থাকি ইসপেটর।

কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দারোয়ান গेट খুলে দিল।

ভালজাঁ বললো,—চলো ইসপেটর, আমি উপরের তলায় থাকি।

জাভেয়র বললো,—তুমিই যাও ভালজাঁ। আমি নিচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ভালজাঁ অবাক হলেন। জাভেয়রের এমনি কঠোর তিনি আর কোনদিন শোনেনি। জাভেয়রের আজকের ব্যবহারে তিনি সত্যি বিস্মিত।

ভালজাঁ আবার বললেন,—আমি তাহলে দেখা করে আসি?

—তাইতো তোমাকে বললাম ভালজাঁ! যাও দেরি করো না।

উপরের তলায় সিঁড়ির বাঁকে একটি জানালা। সেখান দিয়ে বাড়ির গেটের সামনে থেকে শুরু করে গলির বেশ কিছুদূর অবধি দেখা যায়। জানালাটি খোলা ছিল। দোতলায় যাবার পথে ভালজাঁ কি ডেবে জানালা দিয়ে বাইরে নিচের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। গেটের সামনের নির্দিষ্ট স্থানে জাভেয়র দাঁড়িয়ে নেই। গলি, খের দিকে তাকিয়ে তিনি বিষয়ে দেখতে পেলেন যে, ইসপেটর জাভেয়র চলে যাচ্ছে। ভালজাঁ খ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে-দেখতে ইসপেটর জাভেয়র দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ভালজাঁ বাড়ির ভেতরে চলে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত ইসপেটর জাভেয়র চূপ করে দাঁড়িয়েছিল। দারুণ সেই ঝড়ের দাপাদাপি তখন যেন তার মনের মধ্যে আরো উদ্দাম হয়ে উঠছে, ক্ষণে-ক্ষণে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের মত সারা মুখে চিন্তার রেখা। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপর ইসপেটর জাভেয়র ধীরে-ধীরে গলি ধরে চলতে লাগল।

গলি ছেড়ে সে রাজপথে পড়ল। রাত তখন দ্বিপ্রহর। জনশূন্য ধমধমে রাজপথ। দীর্ঘকায় দুর্দান্ত ইসপেটর জাভেয়র মাথা ঝুকিয়ে-ঝুকিয়ে আস্তে-আস্তে রাজপথ বেয়ে চলছে।

চিন্তার যে বাড় আজ সকাল থেকে জাভেয়রকে ক্ষণে-ক্ষণে বিপর্যস্ত করছে, তার উদ্দামতা তখন আরো বেড়ে চলেছে। পথ চলতে-চলতে জাভেয়র একসময় কপালের দু'পাশের শিরা দুটো টিপে ধরলো। ওর মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে।

জাভেয়র ভাবছিল, কোনটা বড়? সে যাকে মূলতঃ কর্তব্য বলে মনে করে, না যা মানবতা? ভালজাঁ আজ তাকে জীবন দান করেছে। যাকে সে খুনে ডাকাত বলে মনে করে সেই ভালজাঁ আজ তার জীবনের বড় শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে।

জাভেয়র এই চিন্তাকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিতে চাইল। নিজেকেই এক ধমক দিয়ে যেন সে বললো,—এসব কি হচ্ছে ইসপেটর জাভেয়র? তোমার একি মতিভ্রম হয়েছে! জীবনে যে কাজ তুমি কখনো করনি তাই আজ তুমি করছো? ভালজাঁ অপরাধী, দাগী আসামী, খুনে ডাকাত—তাকে ধরার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে তুমি চেষ্টা করছো। তাকে বাগে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিচ্ছো? যাও, ফিরে যাও জাভেয়র, এখনো সময় আছে, তাকে গিয়ে পাকড়াও করো।

কিন্তু পারলো না জাভেয়র। পারলো না সে ফিরে যেতে। পাগলের মতো সে বলে উঠলো,—না না না! জাভেয়র, তুমি যেও না, তুমি তো আজ সেই দুস্রাকে ছেড়ে দিয়েছো।

দু'হাত কপালের দু'পাশে চেপে ধরে পাগলের মতো চিৎকার দিয়ে উঠলো জাভেয়র। পরমুহূর্তেই সে সঙ্কট ফিরে পেল। চোখে ভেসে উঠলো প্রসারিত জনশূন্য রাজপথ, নীরব ধমধমে রাত, রাতার আলো।

চারদিকে যেন ছবির ভাঁড়। জেলখাটা দাগী আসামী জাঁ ভালজাঁ, লোকপ্রিয় মেয়র মঁসিয়ে ফোশল্ভার নানা কাহিনীর বিপরীতধর্মী ছবিগুলো যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে—মঁদলেন আর ফোশল্ভা।

লোকহিতকর নানা কাজের জানা-অজানা কাহিনীগুলো ছবি হয়ে যেন তার সামনে নৃত্য করছে। জাভেয়র বিমোহিত হল। সাথে সাথেই আবার মনে-মনে বলে উঠলো,—ভালজাঁকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে। এরপরও তাকে চাকুরী করতে হবে। অসহ্য, এ যে অপমান! জাভেয়র আবার নিজেকেই শুধালো,—ইসপেটর জাভেয়র, একে তুমি অপমান বলছো, কিন্তু এর নামই তো মানবতা।

ভাবনার ঝড়ের মতন তখন আরো বেড়ে গেছে। জাভেয়র ক্ষণে আচ্ছন্ন, ক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় পথ চলছিল। একসময়ে ঝড়ের দাপাদাপি যেন ঝিম ধরলো। জাভেয়র তখন ভাবছিল, আত্মহত্যা ছাড়া তার আর উপায় নেই।

মাথায় অসহ্য ব্যথা। শিরাগুলো যেন দপদপ করে জ্বলছে। পথ চলতে-চলতে এক সময় জাভেয়র সীন নদীর সেতুর উপর এসে দাঁড়ালো। বর্ষার ভরা নদী। সেতুর রেলিং-এর নিচে জলের ঘূর্ণি। জাভেয়র দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পানির সেই গভীর দেখে দেখতে লাগলো। সেতুর খুঁটির গায়ে ডেউগুলো আছড়ে পড়ছে। জাভেয়র তার মাথার

টুপি খুলে ফেলে দু'হাতে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলো। তারপর আবার রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে দেখতে লাগলো চেউয়ের মাচন। ধীরে-ধীরে সে যেন অন্য কোন জগতে হারিয়ে গেলো। সারামুখ ভরে গেলো প্রশান্তিতে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজে সে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো। দু'হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকালো। তারপর রেলিং-এর উপর উঠে নদীর সেই গভীর দেহে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দূরন্ত 'সীন' গ্রাস করে নিল জ্ঞানেশ্বরকে।

বিছানার উপরে টেবিলের উপর জ্বলছে তিনটি বাতি। তার পাশে ডাক্তারের যন্ত্রপাতি। অতিরিক্ত রক্তপাতের দরুণ ম্যারিউস সেই যে নেতিয়ে পড়েছে, তারপর এখনো চোখ মেলেনি।

ডাক্তার এসে রোগীর দেহের আহত স্থানগুলো পরীক্ষা করেন। কাঁধের হাড় ভেঙ্গে গেছে। বেশ গুরুতর আঘাত। হাতে ও মাথার কয়েক জায়গায় তরবারির আঘাত লেগেছে। মাথার বেশ খানিকটা কেটে গেছে। একটি গুলী পাজরের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ায় স্থানটা খানিকটা মারাত্মকভাবে ছিঁড়ে গেছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন,—রোগীর নাড়ী এখনো বইছে। বুক পিঠের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে আঘাতের ফলে রোগী জ্ঞান হারিয়েছে এবং রক্তপাতে রোগী নেতিয়ে পড়েছে—এটাই একটু চিন্তার বিষয়! তবে ভাববেন না।

বললেন বটে ডাক্তার। তবে তাঁর ভাব দেখে মনে হলো তিনিও চিন্তামুক্ত নন। কাপড় ভাঁজ করে তিনি রোগীর রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন আর বিড়-বিড় করে অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে কি যেন বলছিলেন।

এমন সময় ঘরের দরোজা খুলে প্রবেশ করলেন মঁসিয়ে জিল্নরমা। পাশের ঘরটিই তাঁর শয়নকক্ষ। বাড়ির সবার সাবধানতা সত্ত্বেও পাশের ঘরে লোকজনের আনাগোনার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঘুম ঠিক নয়, বলা চলে তন্দ্রার ঘোর। গত ক'দিন থেকেই মঁসিয়ে জিল্নরমা মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকেই এটি শুরু হয়েছে। চিন্তা-ভাবনায় গত কিছুদিন থেকে মন তাঁর বিপর্যস্ত। আগের রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। আজকে তিনি সন্ধ্যা গড়াতেই বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু নিদ্রা এলো না। ক্লান্তিতে চোখের পাতা যেন ভারী হয়ে নেমে আসতে চাইছে; কিন্তু ঘুম আসছে না। অনেক রাতে তন্দ্রার ঘোর যা-ও বা এলো, পাশের ঘরে লোকজনের ফিস্‌ফাস্‌ শব্দে তাও ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ঘরের আলো দরোজার ফাঁকর গলিয়ে এ ঘরে এসে পড়েছে।

মঁসিয়ে জিল্নরমা জিজ্ঞেস করলেন,—কে, কে ঐ খাটে? কে শুয়ে রয়েছে? ম্যারিউস? তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

একজন চাকর জবাব দিল,—হ্যাঁ হুজুর! ম্যারিউস অবরোধে গিয়েছিলেন। খানিক আগে এক ব্যক্তি তাঁকে দিয়ে গেলেন।

মঁসিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে আরো সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন,—ওকি তাহলে মরে গেছে? ম্যারিউস! ম্যারিউস! কথা বলছো না কেন? ম্যারিউস! ডাক্তার! কথা বলছো না কেন?

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। ম্যারিউসের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা তাকিয়ে থাকলেন মঁসিয়ে জিল্নরমা। তারপর পাগলের মতো অটোহাস্যে ফেটে পড়লেন। বলতে লাগলেন,—আমার উপর অভিমান করে ও আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমাকে জব্দ করার জন্যে অবরোধে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। ম্যারিউস! ম্যারিউস! তুই আমাকে এমনি করে জব্দ করলি!

ছটফট করতে লাগলেন মঁসিয়ে জিল্নরমা। ডাক্তার মঁসিয়ের অবস্থা দেখে উদ্ভিগ্ন হলেন। তিনি উঠে মঁসিয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মঁসিয়ে বললেন,—আমি ঘাবড়াইনি ডাক্তার, আমি ভেঙে পড়িনি। সব কিছু আমি সহ্য করে নেবো ডাক্তার। আমি ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যু দেখেছি। আমি পুরুষ মানুষ। এই খবরের কাগজগুলিই হলো যত নষ্টের মূল। তুমি ভাবছো ডাক্তার আমি রাগ করেছি। যে মরে গেছে তাকে নিয়ে রাগ করে আর কি করবো। কিন্তু ডাক্তার! ওকে আমি বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। ও যখন ছোট শিশু তখন ওর বাবা মারা যায়। ওর মা-ও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সাধারণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে ও মারা গেল আর আমি এই বৃদ্ধ অথর্ব্য বেঁচে রইলাম! একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। হায়রে ম্যারিউস! আমার নয়নমণিরে! কোথায় হৈ-ঠে করে এই বয়সে আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাবি, না লড়াই করতে গিয়ে গুলীর ঘায়ে প্রাণ হারাবি।

মঁসিয়ে জিল্নরমা যখন এমনি বিলাপ করছিলেন এমন সময় ম্যারিউস চোখ মেলে-তাকালো। দু'চোখে হাজার বছরের ক্লান্তি। মঁসিয়ের দিকে অবসাদভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো।

মঁসিয়ে জিল্নরমা অভাবিত বিশ্বয়ে আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন,—আমার ম্যারিউস! আমার নানাভাইমণি, তুই তাহলে বেঁচে আছিস! তুমি রক্ষা কর ঈশ্বর! বলতে বলতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

চারমাস পর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার জানালেন ম্যারিউসের জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই। তার অবস্থা এখন ক্রমাগত উন্নতির পথে। তবে কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় আরো কিছুদিন ম্যারিউস চলা-ফেরা করতে পারবে না। অন্ততঃপক্ষে আরো দু'মাস তাকে শুয়ে কাটাতে হবে।

এই চারমাস ম্যারিউস বহবার জুরের ঘোরে অথবা রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপ বকেছে এবং কোজেতের নাম করেছে। প্রলাপের ঘোরে সে অবরোধের কথা, বন্ধুদের কথা, লড়াইয়ের কথা বলতো। ডাক্তার বাড়ির লোকজনকে বার-বার বারণ করে দিয়েছেন—দেখবেন, এমন কিছু না হয় যাতে রোগীর কোনরকম উত্তেজনার কারণ ঘটে। এই চারমাস মঁসিয়ে জিল্নরমা বলতে গেলে প্রতি রাতেই ম্যারিউসের শয্যার পাশে বিনীত রজনী যাপন করেছেন। এ সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রতিদিন একজন অভিজাত ধরনের বৃদ্ধ দারোগানের কাছ থেকে ম্যারিউসের খবরাখবর নিয়ে যান। ম্যারিউসের ক্ষত বাঁধবার জন্যে তিনি ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে আসতেন। বাড়ির দারোগায়ানই খবরটি জানালো। সেই বৃদ্ধ কখনো দিনে দু'তিনবারও আসেন।

এদিকে দীর্ঘদিন রোগভোগের দরুণ ম্যারিউস বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেলো।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাক্তার যেদিন মঁসিয়ে জিল্লনরমাকে জানালেন যে ম্যারিউসের ব্যাপারে এখন আর কোনরকম শঙ্কার কারণ নেই, সেদিন বৃদ্ধের খুশী দেখে কে! আনন্দের আতিশায্যে তিনি শিতর মতো কাণ্ড কারখানা শুরু করলেন। কখনো ম্যারিউসকে বললেন,—কি খবর ব্যারন ম্যারিউস! কখনো বলে উঠলেন,—সাধারণতঃ জিন্দাবাদ! খুশীতে তিনি কখনো আপন মনে হাসেন, কখনো একে-ওকে মোহর পুরস্কার দেন। অবস্থা দেখে কে বলবে যে ইনিই সেই আভিজাত্যপূর্ণিত মঁসিয়ে জিল্লনরমা। কে বলবে ইনিই এ বাড়ির গৃহকর্তা! মনে হচ্ছিল ম্যারিউসই যেন এ বাড়ির গৃহকর্তা।

ম্যারিউসের শরীর ধীরে-ধীরে সারতে লাগল। জ্বর থেমে যেতে ম্যারিউসের প্রলাপ বকা শেষ হলো। কিন্তু কোজেতের নাম সে আর মুখে আনে না। সারাক্ষণ ম্যারিউস কি যেন চিন্তা করে। মুখে কিছু বলে না, তবে মুখ দেখলে বোঝা যায়, চোখ যেন তার কোন সুদূরে নিবদ্ধ। এক নজরেই বোঝা যায়, স্মৃতির পাতায় সে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আসলে কোজেতকে ম্যারিউস ভোলেনি। ভোলা তার পক্ষে এই জীবনে সম্ভব নয়। কোজেত কোথায় কি করছে, কেমন আছে, কিছুই সে জানে না। আর মঁসিয়ে ফোশল্ভা, তিনিই বা কোথায়? ফোশল্ভার কথা মনে পড়তেই অপরাধের কথা, লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। বন্ধুদের মুখ, লড়াইয়ের দারুণ মুহূর্তগুলো, গুলীর আঘাত এসব তার চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠে। সেই ছবির মেলায় আবছা মতো মঁসিয়ে ফোশল্ভার মুখটিও ভেসে উঠে। মঁসিয়ে সেখানে কেন গিয়েছিলেন? আরেকটি কথা, কে তাকে উদ্ধার করল? কে সেই অসমসাহসি মহানুভব ব্যক্তি? কি করে তিনি উদ্ধার করলেন? বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করেছে ম্যারিউস। বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করেছে। কেউ কোন খবর দিতে পারলো না। ম্যারিউস ভাবে। মঁসিয়ে ফোশল্ভা কি জানেন কে সেই ব্যক্তি? তাকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

কোজেতের কথা যখন মনে পড়ে তখন বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কতদিন হলো সে কোজেতকে দেখে না।

ম্যারিউস ভাবে, কোজেতকে ছেড়ে সে থাকবে না। নানাভাই কিংবা যেই হন না কেন, ম্যারিউসকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এতে অনেক বিপত্তি, অনেক অন্তরায় আসবে জানে ম্যারিউস তাতেও সে পিছুপা হবে না। এটাই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা সম্পর্কেও ম্যারিউসের মনোভাবের তেমন পরিবর্তন হয়নি। বৃদ্ধ তার জন্যে এত কিছু করলে কি হবে, ম্যারিউস ভাবে অন্য রকম, সে ভাবে এও এক চাল। ম্যারিউসের মনে হয়েছে, মন ভোলাবার জন্যেই বৃদ্ধ এসব করেছে। সে অসুস্থ ভাই মঁসিয়ে জিল্লনরমা কোন হিত্তি করছেন না। তাছাড়া ম্যারিউস কোন কথায় বিরোধিতা করছে না। কিন্তু তা আর ক'দিন! মঁসিয়ের কথার বিরোধিতা করলেই তিনি আবার আগের মতো ভেলে-বেঙনে জলে উঠবেন। আর কোজেতের প্রসঙ্গ উঠলেই এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

ম্যারিউস আগেরভাণেই মনস্থির করলো। নানাভাই-এর সাথে সে সহজ হতে পারলো না। মঁসিয়ে কথা বললে ম্যারিউস টুকটাক সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ করে থাকে। মঁসিয়েকে সে আগের মতো নানাভাই বলেও ডাকে না। মঁসিয়ে ভীষণ দুঃখ পেলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। মনে হলো, ধীরে ধীরে মেঘ জমে উঠছে। মেঘ কেটে যায় ভালো, নইলে নানা ও নাতীর মধ্যে আবার প্রচণ্ড ঝড় উঠবে। একদিন কথায়-কথায় বিপ্লব সম্বন্ধে কথা উঠলো। মঁসিয়ে জিল্লনরমার মুখের উপর বিভিন্ন কথায় ম্যারিউস এমন এক মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে যে তিনি ভে 'থ' হয়ে গেলেন। মঁসিয়ের জেদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি বললেন,—তুমি ভুল বলছো ম্যারিউস, তোমার মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর।

এরপর সারাদিন মঁসিয়ে জিল্লনরমা ম্যারিউসের সাথে একটি কথাও বললেন না। ম্যারিউস এবার সত্যি-সত্যি চিন্তায় পড়লো। মনে-মনে সে বুদ্ধি আঁটতে লাগলো। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। বুড়ো এবার হয়তো বলবে,—কোজেতের চিন্তা বাদ দাও। ম্যারিউসও তাহলে আচ্ছা জরুর করবে সবাইকে। খাবার খাবে না, গুমুধ ছোঁবে না। ম্যারিউস গুম মেরে পড়ে রইলো।

কয়েকদিন পরের কথা। মাদাম জিল্লনরমা ও মঁসিয়ে জিল্লনরমা দু'জনেই ম্যারিউসের ঘরে এসেছে। মাদাম টেবিলের ওপর গুমুধের শিশিগুলো সাজিয়ে রাখছিলেন। ম্যারিউসকে মঁসিয়ে বললেন,—তুমি নাকি মাংস খেতে চাচ্ছ না। শরীর সারতে হবে না? মাংস না খেলে চলবে কি করে?

ম্যারিউস চুপ করে রইলো। তারপর বেশ গভীর কণ্ঠে বললো,—আপনার সাথে একটি কথা ছিল।

মঁসিয়ে চমকে উঠলেন, বললেন,—কি কথা?

—আমি বিয়ে করবো বলে মন স্থির করেছি।

মঁসিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন,—ওহো, এই কথা, তাই বলা। আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। এবার আর মন মানছে না। বেশতো আমি রাজী আছি। ওর জন্যে অত চিন্তা কিসের!

—রাজী আছেন? কার সাথে বিয়েতে রাজী আছেন?

—বললাম তো চিন্তা নেই। তোমার সেই কোজেতের সাথেই বিয়ে হবে। আমি রাজী আছি।

ম্যারিউস গভীর বিশ্বাসে তাকিয়ে রইলো মঁসিয়ে জিল্লনরমার দিকে। আনন্দে আবেগে তাঁর ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে। তারপর দু'হাতে মঁসিয়েকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে বললো,—নানাভাই! সত্যি বলছেন তো?

ম্যারিউসের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মঁসিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমার পাগলা ভাই, সত্যি বলছি। কোজেত তোমার রোজ খবর নেয়। একজন বুড়ো ভদ্রলোক বোজে-খবর নিয়ে যান। কোজেত তার হাতে রোজ তোমার জন্যে ব্যাণ্ডেল পাঠাতো। আমি খবর নিয়েছি, মেয়েটি বেশ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। তাছাড়া ভদ্র-নন্দ্র তো বটেই। সাত নম্বর হোমি আমি লেনে তারা থাকে। কয়েকদিন পরে আমি তাদেরকে বাসায় নিমন্ত্রণ করে আনবো।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—তুই আমাকে ভুল বুঝিস না ম্যারিউস। তার চোখেও তখন আনন্দাশ্রু।

ম্যারিউস জিল্লনরমার বুকে মুখ গুঁজে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললো,—নানাভাই, আমার লক্ষী নানাভাই। আমার সোনামণি নানাভাই।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—আমি এতদিন যে কি যাতনায় ছিলাম ম্যারিউস। আজ আমার বুকের ভার অনেকটা কমলো। এতদিন পর তুমি আমার সেই আগের মতো নানাভাই বলে ডাকলে—একবার নয়, তিনবার। আমার মতো সুখী আর কে আছে। আমি আজই তাদের ডেকে পাঠাবো। বললো, কোজোতকেও যেন নিয়ে আসে।

সেদিন বিকেলে মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ এলেন মঁসিয়ে জিল্লনরমার বাড়িতে। সাথে এলো কোজোত। জাঁ ভালজাঁকে কেউ চিনতে পারেননি। সেই জ্বাল রাতে আহত ম্যারিউসকে অচেনা যে মহানুভব ব্যক্তি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, তিনিই যে মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ তা কেউ কল্পনাও করেনি। ভাবা সম্ভবও নয়। সর্বাস রক্ত ও কাদামাখা বিধ্বস্তকিমাকার চেহারার জাঁ ভালজাঁর সাথে আজকের জাঁ ভালজাঁ ওরফে মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁর কোন মিলই নেই।

সাদাচুল হাসিমুখ জাঁ ভালজাঁকে বাড়ির সবাই সমাদর করে বসালেন।

মঁসিয়ে বললেন,—আপনার সাথে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম। বসুন, আরাম করে বসুন।

জাঁ ভালজাঁ দ্বিত হানলেন। মিষ্টি অথচ উদাস হাসি। মনে হয়, সে হাসির আড়ালে কে যেন পাখিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো মনে হয়, আনমনা হাসি ছড়িয়ে রয়েছে জাঁ ভালজাঁর মুখে; আবার কখনো মনে হয়, এটা বুঝি চোখের বিভ্রম।

জাঁ ভালজাঁর বগলে একটি প্যাকেট। হালকা সবুজ রঙের কাগজে মোড়া। দেখে মনে হলো একটা বই তিনি মুড়ে এনেছেন।

কোজোতের সাথে ম্যারিউসের আবার দেখা হলো। প্রথমে কেউ কোন কথাই বলতে পারলো না। আবেগে কোজোত বাকশূন্য হয়ে গেছে। ম্যারিউসের মুখেও চট করে কথা এলো না।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—কি হে। ব্যারন ম্যারিউস পামেররসি! বুঝলে, আমার কথার নড়াচড়া নেই। কথা দিয়েছিলাম, তা ওকে হাজির করেছি কিনা দেখো।

জাঁ ভালজাঁকে বললেন মঁসিয়ে জিল্লনরমা,—প্রস্তাবটি আমি দিচ্ছি মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ। আপনার মেয়েকে আমার নাতবৌ করার ইচ্ছে করছি। তাতে আপনার সম্মতি চাচ্ছি। আপত্তি নেই তো?

জাঁ ভালজাঁ ওরফে ফোশল্ভাঁ এর জবাবে মাথা নুইয়ে সম্মতি দিলেন।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—খুশি হলাম মঁসিয়ে। ভীষণ খুশি হলাম। এ বিয়েতে আহলে আপনার সম্মত নেই?

—এতো আমার পরম পৌভাগ্য, আমার মা-মণির পরম কামনা! আমিও খুশি হলাম। জবাব দিলেন জাঁ ভালজাঁ।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বললেন,—আমি খুব খুশী হয়েছি মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ। বোজ নিয়েছি আর এবার স্বচ্ছ দেখলাম মেয়ে আপনার বেশ সুন্দরী, বেশ লক্ষী। এমনি মেয়েই এবাড়িতে আমার নাতবৌ হয়ে আসার যোগ্য। আর দেখুন অনেকে হয়তো অনেক কথা বলতে পারে। আমি বলি, এ বিয়েতে আপত্তির কি আছে?

মঁসিয়ে জিল্লনরমা বিয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বন্ধা-চণ্ডা একটি বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। কোজোতের গুণপনাও বর্ণনা করলেন। তারপর ম্যারিউসকে লক্ষ্য করে বললেন,—তবে তোমার কিন্তু কষ্ট হতে পারে। আমার যা কিছু রয়েছে, তার অর্ধেকেরও বেশী হলো সংসার খরচের জন্যে। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন কোন অসুবিধা হবে একথা বলছি না। তোমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এই বুড়ো যদি আরো পনের-বিশ বছর বেঁচে থাকে, তবে তোমাদের জন্য হয়তো কপর্দকও অবশিষ্ট থাকবে না। তাই বলছিলাম, একটু কষ্ট হতে পারে। তুমিও শোন কোজোত, ব্যারনের ক্রী হলেও কিন্তু বেশ কষ্টেস্টে চলতে হবে।

—কষ্ট হয়তো হবে না মঁসিয়ে জিল্লনরমা। ইউফ্রসি ফোশল্ভাঁর প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক জমা আছে—জাঁ ভালজাঁ গধীর স্বরে ধীরে-ধীরে বললেন।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা ধমকে গেলেন। বললেন,—ঠিক কথাটা বুঝলাম না মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ। প্রায় ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক ইউফ্রসি'র রয়েছে, কিন্তু? তার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?

—নানাভাই, আমারই ভাল নাম ইউফ্রসি ফোশল্ভাঁ। কোজোত বললো।

—ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক! মানে তোমার অত টাকা জমানো আছে?

—হ্যাঁ, ওর নামেই টাকাটা জমা রয়েছে। ঠিক ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক নয়, পনের ষোল হাজার কম হতে পারে। বললেন জাঁ ভালজাঁ।

বাড়ির আর সব লোকও কম অবাক হয়নি। ম্যারিউসের ছোট খালা বললেন,—ওমা! এ সব তো কখনো ম্যারিউস বলেনি।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি ছাড়া একথা তেমন আর কেউ জানতো না। তা, আমি ওগুলো সাথেই এনেছি। এই যে দেখুন আপনারা।

জাঁ ভালজাঁ সবুজ কাগজে মোড়া প্যাকেটটি খুললেন। দেখা গেল বই নয়, একগাদা ব্যাঙ্ক নোট।

মঁসিয়ে জিল্লনরমা তখন খুশিতে হাসছেন। বললেন,—রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্ব দেখছি। নাতী আমার ভুবে-ভুবে অনেক পানিও খেয়েছে দেখছি।

কথাবার্তা পাকা হলো। ডাঙারের সাথে আলাপ করে ঠিক হলো যে দু'মাস পর অর্ধাংশ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ওদের বিয়ে হবে।

ফাতিনের মেয়ে কোজোত। দুঃখী ফাতিনের দুঃখী মেয়ে কোজোত। একে মেয়ে হিসাবে বরণ করে নিয়ে ছিলেন জাঁ ভালজাঁ—যখন তিনি ছিলেন এমসুরেম, মটিল সুরেম শহরের মেয়র।

ফাতিনের জীবন দুঃখেই ঘেরা। সামাজিক পঙ্কিলতার গভীর থেকে জেগে উঠা মেয়ে ফাতিন। কে তার পিতামাতা, কেউ তা জানে না, সে নিজেও তার হৃদিস পায়নি।

এইটুকু জানতো ফাতিম, তার জন্ম হয় এমসুরেম শহরে। ফাতিম নামটিও অপরের দেয়া। খালি পায়ে রাস্তায় ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা করছিল ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। তাকে দেখে, এক পথিকের দয়া হলো। তিনি তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। মেয়েটির নাম হলো ফাতিম—লিটল ফাতিম। ফাতিমের যখন ১০ বছর বয়স, তখন সে শহর ছেড়ে চলে গেল শহরতলীতে। সে খামারের চাকুরী নিল। ১৫ বছর বয়সে ভাগ্যান্বয়ণে ফাতিম চলে এল প্যারিস। ফাতিম ছিল ভারী সুন্দরী। সোনালী চুল। মুক্তের মতো দাঁত সব।

ফেলিক্স থলোমী বলে একটি যুবককে সে স্বামী মর্যাদা দিয়েছিল। অথচ একদিন ফেলিক্স থলোমী তাকে ত্যাগ করলো। কান্না ছাড়া ফাতিমের তখন আর কোন সখল ছিল না। এই ফেলিক্স কোজেতের পিতা। ফেলিক্স যখন ওদের ছেড়ে চলে গেল, তখন কোজেতের বয়স দু'বছর দু'মাস।

এই ঘটনার মাস দশেকের পরের কথা। প্যারিসের কাছে মন্টকরমেল নামক এক জায়গায় একটি সরাইখানা গোছের দোকানের সামনে ফাতিমকে দেখা গেল। সাথে তিন বছরের মেয়ে কোজেত। সেই আগের ফাতিমকে আর চেনা যায় না। তেহারার সেই উজ্জ্বলতা নেই, পোশাক মলিন। দোকানটির মালিক ছিল থিনারডিয়্যার। দোকানের সাথেই তার বাসা। সেখানে তাঁর স্ত্রী মাদাম থিনারডিয়্যার ও ছেলেমেয়েরা সবাই একত্র থাকে।

ফাতিম তাদেরকে জানাল,—সে খেটে খায়। তার স্বামী মৃত। মেয়েটিকে কারো কাছে রাখতে পারলে সে একটু শান্তি পেত। এ বাবত সে মাসোহারা দেবে। মাসোহারার পরিমাণও ঠিক করা হলো। থিনারডিয়্যার দম্পতি কোজেতকে তাঁদের কাছে রাখলেন। এক বছরের আগাম মাসোহারা রেখে দিলেন।

এরপর দু'বছর কেটে গেছে। কোজেতের বয়স এখন পাঁচ। এই ছোট মেয়েটির উপর থিনারডিয়্যার দম্পতি অবিচারের চূড়ান্ত করেন। তাকে ঘর মুছতে হয়, সব কিছু ঝাড়-পোছ করতে হয়, বাড়ির বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় ধুতে হয়, এমনকি থিনারডিয়্যার তাকে দিয়ে বোঝা টানায়। কষ্টে-কষ্টে মেয়েটি শুকিয়ে গেছে। এদিকে ফাতিমকে ঠিকই টাকা যোগাতে হচ্ছে। টাকার জন্যে থিনারডিয়্যারের তাগাদার অন্ত নেই।

কোজেতকে রেখে ফাতিম তার সেই শৈশবের শহর এমসুরেম চলে গেল। মঁসিয়ে মাদলেন তখন সেই শহরের মেয়র। ফাতিম একদিন তার নকল চুনী বানাবার কলখানার মহিলা বিভাগে চাকুরী পেল, কিন্তু শহরে নানান শোকের মধ্যে তাকে নিয়ে কানাকানি শুরু হলো, শেষে একদিন কারখানা থেকে তার চাকুরী গেল। মাত্র ৫০ ফ্রাঙ্ক দিয়ে তাকে বিদায় করা হলো। মহানুভব মঁসিয়ে মাদলেন এ সব কিছু জানতেন না। দুঃখী ফাতিমের দুঃখের কাহিনীও তাঁর জানা ছিল না। তাছাড়া ফাতিমও মঁসিয়ে মাদলেনকে তার দুঃখের কাহিনী জানাবার সুযোগ পায়নি।

শহর ছেড়ে চলে গেল না ফাতিম। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। তার অনেক টাকা প্রয়োজন। এই টাকার প্রয়োজনে সে একদিন তার সুন্দর মাথায় চুল বিক্রি করে

দিল। একদিন খবর এলো, কোজেত দারুণ অসুস্থ। তার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। চিকিৎসার জন্যে টাকার প্রয়োজন। এই টাকা যোগারের জন্যে ফাতিম মাত্র ৪০ ফ্রাঙ্ক তার মুক্তের মতো সাজানো দাঁতের পাটি এক দস্তচিকিৎসকের কাছে বিক্রি করে দিল।

তারপর একদিন কোন এক কারণে ফাতিম পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। ইসপেক্টর জাভেরর তাকে হাজতে আটকালো। মেয়র মাদলেন এই দুঃখীর কাহিনী জানতে পারলেন। ফাতিমকে মুক্তি দেয়ার জন্যে তিনি জাভেররকে নির্দেশ দিলেন। জাভেরর এ নির্দেশ মেনে নিতে রাজী হলো না! কিন্তু মেয়রের নির্দেশ—মুক্তি পেল ফাতিম।

অসুস্থ ফাতিমকে নিয়ে এলেন মাদলেন নিজের গৃহে। তার দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনলেন, কোজেতকে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু ফাতিমকে বাঁচানো গেল না। সে মারা গেল।

কোজেতের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জাঁ ভালজাঁ যাবতীয় করণীয় কাজ সমাধানের জন্যে নতুন উদ্যমে লেগে গেলেন। এককালে তিনি মেয়র ছিলেন, তাই আইনের খাণ্ডলো তার জানাই ছিল। কোজেতের মৌতুকের টাকা, বংশ-পরিচয়, অভিভাবক ইত্যাদি সম্পর্কে আইনসম্মত ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো। মঁসিয়ে জিল্লনরমা হলেন কোজেতের আরেক অভিভাবক। লোকে জানলো কোজেত যে বংশের মেয়ে সে বংশের জাঁ ভালজাঁ ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। তিনি কোজেতের বাবা নন, চাচা। কোজেতের বাবা হলো তার বড় ভাই ফোশল্ভাঁ। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী কোজেতকে ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্ক দান করেছিলেন। তিনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। টাকাটা ভালজাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল। বিয়ের ক'দিন আগে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা হলো। ভালজাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল খানিকটা খেতলে গেল। ব্যাপারটা প্রথমে কেউ জানতে পারেনি। ব্যাডেজ দেখে সবাই জানতে পারলো মঁসিয়ে ফোশল্ভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ আঘাত পেয়েছেন। এ নিয়ে কাউকে কোন চিন্তা না করার জন্যে ভালজাঁ বললেন, এমনকি তিনি কাউকে শুশ্রূষা পর্যন্ত করতে দিলেন না; হাতে আঘাতের জন্যে কাগজপত্রে ভালজাঁ স্বাক্ষর করতে পারলেন না। করলেন মঁসিয়ে।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে কাজের তাড়াও তত বাড়ছে। প্রশ্ন দেখা দিলো বিয়ের পর জাঁ ভালজাঁ কোথায় থাকবেন একথা নিয়ে। জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি পুরোনো বাসায়ই থাকবো।

কিন্তু কোজেত তা শুনলো না। মঁসিয়ে জিল্লনরমার বাড়িতে একটি কক্ষ ভালজাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করা হলো। ভালজাঁ তাতে রাজী হন না কিন্তু কোজেত এসে যখন বললো,—আমি তোমাকে অনুরোধ করছি বাবা। এরপর আর জাঁ ভালজাঁ কিছু বলতে পারেননি।

১৬ই ফেব্রুয়ারী আগের দিন সন্ধ্যায় জাঁ ভালজাঁ ম্যারিউসকে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ফ্রাঙ্ক দিলেন। মঁসিয়ে জিল্লনরমাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কোজেত ও ম্যারিউসের বিয়ে হয়ে গেল। গীর্জা থেকে ফিরে এসে মঁসিয়ে জিল্লনরমার বাড়ির বারান্দায় এককোণে একটি চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলেন জাঁ ভালজাঁ।

গীর্জায় যাওয়ার পথে ঘটা একটি ঘটনা তার বারবার মনে পড়ছিল। বিয়ের শোভাযাত্রা যখন যাচ্ছিল তখন পথে তিনি থিনারডিয়াকে দেখেছেন। থিনারডিয়ার তাকে চিনতে পেরেছে।

বারান্দায় বসে-বসে পুরোনো সব নানা কথা ভাবছিলেন, এমন সময় কোজেন্ত এলো। বিয়ের কনের সঙ্গে তাকে সত্যি অপরূপ দেখাচ্ছে।

কোজেন্ত বললো,—বাবা তুমি এ বিয়েতে নিশ্চয় সুখী হয়েছো?

ভালজাঁ বললেন,—হ্যাঁ, মা-মণি। আমি খুব সুখী হয়েছি। কিন্তু একথা জানতে চাইছো কেন?

—তবে তুমি চূপচাপ বসে কি ভাবছো? হাসো না কেন?

ভালজাঁ এবার হেসে উঠলেন! বললেন,—ও এই কথা! পাগলী মেয়ে কোথাকার। বলেই আবার তিনি হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

খানিক পর খাবার টেবিলে মেহমানদের ভাক পড়লো। অতিথিরা একে-একে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। কনের আসনের বামে ও ডানে জাঁ ভালজাঁ অর্থাৎ ছোট ভোশলভাঁ মঁসিয়ে জিল্নরমার বসার জায়গা করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেলে মঁসিয়ে ফোশলভাঁ সেখানে নেই।

মঁসিয়ে ফোশলভাঁ বা জাঁ ভালজাঁর খোজ পড়লো। বাড়ির লোকজন জানালো—মঁসিয়ের হাতে ব্যথা হওয়ায় তিনি বাসায় চলে গেছেন। এজন্যে সবার কাছে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। মঁসিয়ে বলে গেছেন যে, আগামীকাল সকালে তিনি আসবেন।

এদিকে উৎসবমুখর সেই বাড়ি থেকে হোমি আর্মি লেনের বাসায় ফিরে এলেন মঁসিয়ে ছোট ফোশলভাঁ ওরফে জাঁ ভালজাঁ। আলো জ্বললেন। দোতালায় পেলেন। ঘর শূন্য। বৃকের ভেতর একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কোজেন্তের সামান্য যা' জিনিষপত্র ছিল তা নেই। সব ওবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধু রয়েছে ভালজাঁর একটি খাট।

শয্যার কাছে যেতে হঠাৎ একটি জিনিসের উপর চোখ পড়লো। কোজেন্ত কি এটা ভুলে ফেলে রেখে গেছে, না এটা ইচ্ছাকৃত। কোজেন্ত তার এই সহচরটিকে বড্ড হিংসে করতো। ছোট্ট একটি বাস্তব। কোজেন্ত হয়তো ভেবেছে—কিই-বা এমন অমূল্য ধন! হোমি আর্মি লেনের বাসায় সেদিন বিছানায় শিয়রের কাছে এটাকে তিনি রেখেছিলেন। এর উপর ছিল একটি বাতিদান। আজো তেমনি রয়েছে।

পকেট থেকে চাবী বের করে বাস্তবটি খুললেন ভালজাঁ। বাক্সের মধ্যে রয়েছে কোজেন্তের দশ বছর আগের পুরানো কাপড়-চোপড়। বিছানার উপর কাপড়গুলোকে সাজিয়ে একদৃষ্টিতে তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। একসময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। পরম আবেগে কাপড়গুলোকে বুকে জড়িয়ে কান্নাভেজা অশ্রুট কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন,—কোজেন্ত—আমার মা-মণি।

পরদিন দুপুরের কিছু আগে মঁসিয়ে জিল্নরমার বাড়িতে গেলেন জাঁ ভালজাঁ।

পরিচারক তাকে দেখে সালাম জানালো। ভালজাঁ তাকে জিজ্ঞেস করলো,—ম্যারিউস ঘুম থেকে উঠেছে?

সে বললো,—আমি এতুনি খবর দিচ্ছি মঁসিয়ে। আপনি উপরে চলুন।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমি নিচেই বসছি। শোন, শুধু ম্যারিউসকেই খবর দাও। তবে আমার নাম বলো না। শুধু বলবে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তার কিছু গোপন কথা রয়েছে তোমার সাথে।

খবর পেয়েই ম্যারিউস নিচে নেমে এলো। ভালজাঁকে দেখে বললো,—বাবা, আপনি! আমি ভাবছিলাম অন্য কেউ। এখানে বসে কেন, উপরে চলুন।

ভালজাঁ বললেন,—আমি এখানেই বসবো। কিছু কথা রয়েছে।

ম্যারিউস বললো,—তা' হবে তবন। আপনার হাত এখন কেমন? কালরাতে আপনার কথা আমরা সবাই বলাবলি করেছি। চিন্তাও করেছি অনেক।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—আমার হাতে কিছুই হয়নি ম্যারিউস। আমি সবাইকে মিথ্যা কথা বলেছি। ভালজাঁ হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন। আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। ম্যারিউস হতবাক! ভালজাঁ বললেন,—ম্যারিউস, আমি একজন দাগী আসামী।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—ম্যারিউস বললো।

—মানে, আমি জেন খেটেছি!

—আপনি এসব কি বলছেন?—ম্যারিউস জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে ম্যারিউস পমেয়রসী। আমি ১৯ বছর জেল খেটেছি ডাকাতির জন্য। তারপর ছাড়া পেয়ে আবার ডাকাতির জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। আজও আমি পলাতক আসামী।

ম্যারিউস যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জিজ্ঞেস করলো,—এজন্যেই কি আপনি বলছেন যে আপনি কোজেন্তের বাবা নন।

—না মঁসিয়ে, সেজন্যে বলিনি। সত্যি আমি কোজেন্তের কেউ নই! আমি ফেবারলের এক দরিদ্র কৃষক। আমি কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমার ভগ্নিপতি মারা যাবার পর বিধবা ও ছোট-ছোট সাতটি ভাগ্নে-ভাগ্নীর ভরণপোষণের ভার আমার উপর পড়লো। দেশে তখন খাদ্য ও কাজের আকাল। একটি কুটি চুরির জন্যে আমার কয়েদ হলো। আমার নাম ফোশলভাঁ নয়—জাঁ ভালজাঁ।

—কিন্তু এসব কথা যে সত্যি তার প্রমাণ?—ম্যারিউস জিজ্ঞেস করলো।

—আমি তো বলছি মঁসিয়ে। এ কথা মিথ্যে নয়। ভালজাঁ বললো।

ম্যারিউস ভালজাঁর চোখের দিকে তাকালো। এমন প্রশান্ত মুখ থেকে মিথ্যা কথা বেরোতে পারে না।

জাঁ ভালজাঁ বললেন,—কোজেন্ত আমার মা-মণি, আমার নয়নের মণি। কিন্তু আমি কোজেন্তের কে? তার জীবনে আমি একজন পথচারী ব্যক্তি আর কেউ নই। দশবছর আগেও আমি কোজেন্তকে চিনতাম না। আজ কোজেন্ত আমার জীবনেরই আর একটি অংশ। কিন্তু দু'জনের পথ ভিন্ন। এবারে তার অভিভাবকের বদল হয়েছে। এই বদলানোতে কোজেন্ত লাভদান হয়েছে, সুখী হয়েছে। ৬ হাজার ফ্রান্স আমার কাছে যা গচ্ছিত ছিল ও টাকাও অবৈধ নয়। আমার কাজ শেষ হয়েছিল। বাকী ছিল তোমার কাছে আমার আসল পরিচয় দেয়া। তাও আজ আমি দিল্লম মঁসিয়ে পমেয়রসী।

চেয়েছিলি, অভাগী, জীবনে তুই কত কষ্ট পেয়েছিস। এবার তুই সুখী হয়েছিস। তারপর আবেগকল্পিত কণ্ঠে ভালজাঁ বললেন,—কোজেত, আমার মা-মণি! তুমি সুখী হয়েছো। আমার কাজের পালা শেষ হয়েছে।

—আহ, এতক্ষণে তুমি আমাকে কোজেত বলে ডাকলে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো কোজেত। সে খুশিতে ভালজাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো।

ভালজাঁ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। কোজেতকে গভীরভাবে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন, ধীরে-ধীরে তার পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন।

এক সময় ভালজাঁ উঠে দাঁড়ালেন, হাতটি তুলে নিলেন। বললেন,—এবার আমি আসি মাদাম, ওঁরা বোধহয় তোমার শ্রম্য দরজার বাইরে অপেক্ষা করছেন।

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে তিনি আবার দাঁড়ালেন, বললেন,—আমি তোমাকে কোজেত বলে ডেকেছি। তোমার স্বামীকে বলো, এমনটি আর ভবিষ্যতে হবে না। আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছি।

জাঁ ভালজাঁ চলে গেলেন।

পরদিন একই সময়ে ভালজাঁ এলেন। নিচের সেই ঘরটি খুলে দেয়া হলো। কোজেত আজ আর কোন প্রশ্ন করলো না, আগের মতো অবাঁকও হলো না। ভালজাঁর সাথে ম্যারিউসের যে কথাবার্তা হয়েছে, সম্ভবতঃ সে ধরণের কিছু কথাবার্তা ম্যারিউসের সাথে কোজেতেরও হয়েছে।

প্রতিদিন একই সময় মঁসিয়ে জিল্লুরমার বাড়ির নিচের তলার প্রায় অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এসে বসেন ভালজাঁ। বাধাধরা নিয়মের মত কোজেত নিচে নেমে আসে। সামনের চেয়ারে উপবেশন করে। ম্যারিউসের প্রতিদিনই এমন সব কাজ পড়ে যে ঐ সময় সে বাড়ি থাকে না। বাড়ির সবাইও জাঁ ভালজাঁ ওরফে মঁসিয়ে ফোশল্ভার এই চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো।

কয়েক সপ্তাহ চলে গেছে। নতুন জীবনের আনন্দে কোজেত নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছে দিনের পর দিন। সেই বৃদ্ধ লোকটির অচেনা আচরণ, 'মাদাম' বলে তাকে সম্বোধন, মঁসিয়ে জাঁ ভালজাঁর সব কিছু ধীরে-ধীরে কোজেতকে জাঁ ভালজাঁ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগলো। দিনে-দিনে কোজেত খুশিতে আরো হাসি খুশি হয়ে উঠছে, দিনে-দিনে ভালজাঁর প্রতি তার মমতা কমছে। কিন্তু তবু এখনো সে জাঁ ভালজাঁকে ভালবাসে। ভালজাঁও তা' অনুভব করেন।

একদিন হঠাৎ কোজেত ভালজাঁকে বললো,—তুমি আমার বাবা ছিলে; এখন আর তা' নও, তোমাকে আমি চাচা বলে জানলাম। এখন তুমি আর চাচাও নয়। আগে তুমি ছিলে মঁসিয়ে ফোশল্ভার, এখন হয়েছে জাঁ ভালজাঁ। সত্যি করে বলো তো, আসলে তুমি কে? আমার এসব ভাল লাগে না। তোমাকে ভালো লোক বলে যদি জানা আমার না থাকতো তবে আমি সত্যি বলছি তোমাকে আমার দারুণ ভয় করতে হতো।

এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে একদিন কোজেতকে ম্যারিউস বললো,—চল, আজ বিকেলে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। অনেক দিন বাইরে যাই না। আজ আমাদের বাগান বাড়িতে যাবো বলে দিয়েছি।

কোজেত আর ম্যারিউস বিকেলে বাইরে চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে জাঁ ভালজাঁ এলেন। বাড়ির পরিচারক জানালো, তাঁরা ভো বেড়াতে গেছেন, আপনি অপেক্ষা করবেন।

ভালজাঁ নীরবে বসে রইলেন। ঘন্টা খানেকের বেশী কেটে গেলো কিন্তু কোজেত ফিরে এলো না। মাথা নিচু করে ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলে গেলেন ভালজাঁ।

পরদিন যথা সময়ে আবার ভালজাঁ এলেন। আজ কোজেত বাড়ি ছিল। কিন্তু গতকাল যে ভালজাঁর সাথে তার দেখা হয়নি, এ ব্যাপারে একটি কথাও সে বললো না। গতকালকের বেরিয়ে আসার আনন্দে সে তখনও বিভোর।

একদিন জাঁ ভালজাঁ অন্যান্য দিনের তুলনায় কোজেতের সাথে একটু বেশীক্ষণ গল্প করলেন। পরদিন এসে দেখেন যে ফ্যারাপ্রেসে আস্তান নেই। পরদিন যখন আবার এলেন ভালজাঁ তখন দেখতে পেলেন যে, ফ্যারাপ্রেসে খানিকটা আগুন আছে, কিন্তু চেয়ার দুটো যথাস্থানে নেই। দরজার কাছে টেনে এনে রাখা হয়েছে। ভালজাঁ চেয়ারটিকে ফ্যারাপ্রেসের কোণায় টেনে নিয়ে আগের জায়গায় বসলেন।

এর মধ্যে কোজেতের একটি কথায় ভালজাঁ বুঝতে পারলেন, মৌতুকের ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ফ্রাঙ্ক সম্পর্কে ম্যারিউসের মনে সন্দেহ জেগেছে। সে হয়তো ভাবছে এটি সং উপায়ে উপার্জিত নয়। কোজেতের কথা শুনে ভাবলেন, আর না। এবার তার পালা পুরোপুরি সাপ হবে।

এরপর একদিন ভালজাঁ এসে দেখলেন যে, কথাবার্তা বলার সেই ঘরটিতে একটি চেয়ারও নেই। কোজেত নিচে নেমে এসে ভালজাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো,—একি দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ার কোথায়?

ভালজাঁ বললেন,—আজ আর আমি বসবো না মা। ওদের বোধহয় চেয়ারের দরকার পড়েছে। আমিই নিয়ে যেতে বলেছি।

পরদিন ভালজাঁ এলেন না। পরের দিনও নয়। ভালজাঁ অসুস্থ কিনা খোঁজ নেওয়ার জন্যে পরদিন কোজেত লোক পাঠালো। ভালজাঁ তাকে জানালেন যে, তিনি অসুস্থ নন। তবে কাজের খানিকটা চাপ পড়েছে। তাতেই ব্যস্ত রয়েছেন। কয়েক দিনের জন্যে একটু বাইরেও যাবেন। তাঁর জন্যে কোন চিন্তা করার দরকার নেই। শীগগীরই তিনি দেখা করে আসবেন।

এসবই কিন্তু মিথ্যা বললেন ভালজাঁ, তাঁর কোন কাজ নেই। সময়কে বরণ বয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি সেই নির্দিষ্ট সময়ে বাসা থেকে বেরোন। মঁসিয়ে জিল্লুরমার বাড়ির দিকে এগিয়ে যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হয় না। আন্তে-আন্তে সেই পথ চলাও তাঁর কমে এলো।

অস্থির প্রহরগুলো সরিয়ে-সরিয়ে দিন কাটছে ম্যারিউসের, তাকে দোষ দেয়া অনায়াস হবে। বিয়ের আগে সে মঁসিয়ে ফোশল্ভারকে কোন প্রশ্নই করেনি। বিয়ের পর আজ তাকে অর্থাৎ জাঁ ভালজাঁর যাওয়া-আসা বন্ধ করা এবং যতটা সম্ভব কোজেতের মন থেকে তাকে মুছে ফেলার জন্যে ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করছে। এর বেশী আর কিছু নয়। যা প্রয়োজনীয় মনে করছে ম্যারিউস, সে তাই করছে। সে মনে করছে—কোন রকম

কটু কথা বলে বা কঠোর আচরণ না করে, আবার কোন রকম দুর্বলতা না দেখিয়ে ভালজাঁকে এই বাড়ি ও কোজেনের মন থেকে সরিয়ে দেয়ার যথেষ্ট জোরালো কারণ রয়েছে।

কিন্তু একদিন তার ভুল ভাঙ্গলো। সে জানতে পারলো, ভালজাঁ সম্পর্কে সে যা জেনেছে—তাই সম্পূর্ণ নয় এবং সত্যিও নয়। তাকে বলা হয়েছিল—মেয়ের মাদলেনকে জাঁ ভালজাঁ হত্যা করেছে, জাল সই দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মিসিয়ে মাদলেনের পাঁচ লক্ষাধিক ফ্রাঙ্ক তুলে নিয়েছে, পিস্তলের গুলিতে ইসপেটের জাভেররকে হত্যা করেছে। কিন্তু তার ভুল ভাঙ্গলো। সে জানতে পারলো—জাঁ ভালজাঁই হলো সেই মহানুভব মেয়ের মাদলেন, ব্যাঙ্ক থেকে সই জাল করে কোন টাকা তিনি উঠাননি এবং হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি তার পরম শত্রু ইসপেটের জাভেররকে ছেড়ে দিয়েছেন। আত্মদংশনে জাভেরর আত্মহত্যা করেছে। ম্যারিউস জানতে পারলো—মিসিয়ে ফোশল্ভা ওরফে জাঁ ভালজাঁই তার উদ্ধারকারী।

সবকথা জানতে পেরে ম্যারিউস ছুটে গেলো কোজেনের কাছে। বললো,—কোজেন! আমার দারুণ ভুল হয়ে গেছে। আমি অপরাধী। শীপগীর চলো আমার সাথে। তাঁর সাথে আমি দেখা করবো। আর এক মিনিটও দেরি করা সম্ভব নয়।

জাঁ ভালজাঁর শরীর দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। একদিন তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সবে রাত্তায় তিন চার-পা এগিয়েছেন—এমন সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠলো। তিনি একটি পাথরের উপর বসে পড়লেন। কয়েক মিনিট বসে থাকার পর তিনি ধীরে-ধীরে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন শরীর আরো দুর্বল হয়ে পড়লো। তিনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোতে পারলেন না। পরদিন এমন অবস্থা হলো যে, বিছানা থেকে ওঠার তার সামর্থ্য নেই।

রান্না আর গেরস্থালীর টুকিটাকি কাজ করার জন্য একজন মহিলাকে রাখা হয়েছিল। পরদিন সে দেখলো—প্রুটে খাবার সে যেমন সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল, তেমনি রয়েছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো,—কি হয়েছে মিসিয়ে, আপনার শরীর খারাপ নাকি?

ভালজাঁ বললেন,—গতকাল খাইনি। ভাল লাগছে না। কাল খাবো।

দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেলো। কিন্তু ভালজাঁর অবস্থার কোন উন্নতি নেই। এ ক’দিন তিনি ঘরের বাইরেও বেরোতে পারেননি। সারাদিন বিছানার পড়ে থাকেন। পরিচারিকা কোন কথা জিজ্ঞেস করলে ম্লান হাসি হেসে কখনো জবাব দেন, কখনো জবাব এড়িয়ে যান।

পরিচারিকা দেখলো লক্ষণ শুভ নয়। বাড়ির সামনের গলির মাধ্যম এক ডাক্তার রয়েছে। তাঁকে যে ডেকে নিয়ে এলো।

ডাক্তার এসে জাঁ ভালজাঁকে পরীক্ষা করলেন, কথাবার্তা বললেন। নিচে নেমে যাবার আগে তিনি পরিচারিকাকে বললেন,—ওঁর শরীর খুব ভেঙ্গে পড়েছে। বেশ অপুষ্ণ হয়ে পড়েছে। একটু ভাল করে ওঁর যত্ন নেওয়া দরকার।

—ওঁর কি হয়েছে ডাক্তার? পরিচারিকা জিজ্ঞেস করলো।

—হয়েছে সব কিছুই, আবার কিছুই হয়নি—আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, তবে মনে হচ্ছে, তিনি কোন প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। তিনি খুব মানসিক আঘাত পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। তাই বলছিলাম, ওঁর দিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার। ডাক্তার বললেন।

—আপনি আবার আসবেন তো ডাক্তার?

—হ্যাঁ, আসবো।

পরের দিন সন্ধ্যার কথা। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে ভালজাঁ আগের চেয়ে দুর্বল বোধ করলেন। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠতে গেলেন। পারলেন না। মনে হচ্ছে যেন সারাঘর অল্প-অল্প দুলছে। থেকে-থেকে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলেন ভালজাঁ, ধীরভাবে বইছে।

এমনিভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল। বিছানা থেকে ওঠার জন্যে আবার চেষ্টা করলেন ভালজাঁ। শোয়া অবস্থা থেকে বিছানার উপর উঠে বসলেন। ধীরে-ধীরে তিনি তাঁর কাপড় বদলালেন। বাস্তব খুলে কোজেনের পুরোনো কাপড়-চোপড় বের করে বিছানার উপর ছড়িয়ে রাখলেন।

বিশপ মিরিয়েলের দেয়া বাতিদান দুটো টেবিলের উপর রয়েছে। তাতে তিনি মোমবাতি বসালেন। ঘরের সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে দিবালোক। সেই আলোর মধ্যেই তিনি মোমবাতি জ্বালালেন। ঘরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া ও জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করায় তিনি ততক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে তাঁর মনে হলো পা দুটো তার টলছে, ঘর দুলছে। তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি খব-খব করে কাঁপছেন। রাজ্যের শীত যেন তার গায়ে নেমে এসেছে। অতিকষ্টে তিনি উঠে বসলেন। কাগজ-কলম টেনে নিলেন। কল্পিত হস্তে লিখলেন,—

“কোজেন! তুমি সুখী হও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার কাছে আমি এর কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছি। আমার সরে যাওয়া দরকার—একথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তোমার স্বামী কোন অন্যায় করেননি। সংগত কাজই তিনি করেছেন। তিনি অত্যন্ত ভালো। তাকে সবসময় ভালবাসবে—এই পৃথিবী থেকে আমি যখন ওপারে চলে যাবো তখনো। এই কথাগুলোই আমি তোমায় বলতে চাচ্ছি। আর যে টাকা তোমাকে দিয়েছি, তা তোমারই নিজের মনে করবে। অবৈধভাবে ও টাকা অর্জিত নয়। নরওয়ে থেকে আসে সাদা চুনী, ইংলন্ড থেকে আসে কালো চুনী, নকল কালো চুনী আসে জার্মানী থেকে। ফ্রান্সেও আমরা উত্তম মানের নকল চুনী প্রস্তুত করতে পারি। এসব চুনী স্পেনীয়রা অনেক ক্রয় করে। এটি চুনীর দেশ—

এটুকু লিখতে না লিখতেই হাত থেকে তাঁর কলম খসে পড়লো। গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভালজাঁ কল্পিত দু’হাতে তার মাথা চেপে ধরলেন। আপন মনে বরতে লাগলেন,—সব আস্ত হয়ে এলো। আমি আর তাকে কোনদিন দেখতে পাব না। কোজেন! আমার কোজেন! আমার জীবনের এক টুকরো হাসির সামিল আমার

কোজেত। অন্ধকার নেমে আসছে। তাকে না দেখেই আমি এই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। মৃত্যুকে ভয় নেই—কিন্তু তার সাথে দেখা না হলে এই মৃত্যু ভীতিগ্রস্ত। শেষ হয়ে গেছে—সব শেষ হয়ে গেছে। মা-মণিকে দেখতে পাবো না...

এখন সময় দরোজায় করাঘাত হলো।

দরোজায় করাঘাতের শব্দে জাঁ ভালজাঁ ফিরে তাকালেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,— ভেতরে আসুন।

দরোজা খুলে পেলো। কোজেত আর ম্যারিউস দাঁড়িয়ে রয়েছে দরোজায়।

কোজেতকে দেখে নিখর চোখে তাকিয়ে রইলেন ভালজাঁ। চেয়ার থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরম আবেগে কোজেতের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। থর-থর করে কাঁপছেন ভালজাঁ।

কোজেত নৌড়ে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলতে লাগলো,—বাবা, তোমার কি হয়েছে বাবা? আমায় তুমি এতদিন তুলে থাকতে পারলে? তোমার মা-মণিকে না দেখে থাকতে পারলে?

কোজেতের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে জাঁ ভালজাঁ বলতে লাগলেন,—কোজেত! আমার কোজেত! তুমি তাহলে আমায় ক্ষমা করেছে?

দরোজার টোকাঠের পাশে এতক্ষণ ম্যারিউস দাঁড়িয়েছিল। সেও কাছে এগিয়ে এলো, বললো,—বাবা।

—তুমিও আমাকে ক্ষমা করেছে ম্যারিউস। জাঁ ভালজাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

ম্যারিউস একধার কোন জবাব দিতে পারলো না। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইলো। ভালজাঁ আবার বললেন,—তোমায় অনেক ধন্যবাদ ম্যারিউস।

ভালজাঁ ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। কোজেত বললো,—বাবা, তুমি চেয়ারে বসো। তোমার শরীর বড্ড দুর্বল মনে হচ্ছে।

কোজেত চেয়ারের হাতলের উপর বসে ভালজাঁর মাথায় হাত বুলাতে লাগলো। সেই আগে যেমন বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতো, আবদার জানাতো, তেমনিভাবে গলা জড়িয়ে ধরে ভালজাঁর কপালে চুমু দিলো কোজেত।

ভালজাঁ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। কোজেত-ম্যারিউসকে দেখা অবধি সব ঘটনা যেন তাঁর কাছে অবিদ্যমান মনে হচ্ছিল। কোজেতকে তিনি কোন বাধাও দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত শুধু চুপ করে বসে রইলেন।

তারপর ধীরে-ধীরে বললেন,—কোজেতের সাথে দেখা হওয়ার বড় প্রয়োজন ছিল। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তার সাথে দেখা করার কথা আমার বার-বার মনে হচ্ছিল মঁসিয়ে পমেয়রসি। আমি তাকে কোজেত বলেই ডাকলাম মঁসিয়ে। কিছু মনে করো না এ জন্যে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

অনেক কষ্টে এতক্ষণ নিজেকে স্তব্ধ করে রেখেছিল ম্যারিউস, কিন্তু আর পারলো না। কান্নাভেজা কণ্ঠে সে বললো,—ওনজো কোজেত, বাবা কি বলছেন? তিনি আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন, অথচ তোমরা কেউই জানো না, তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন আর তারপর নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে

তিনি একান্তে দূরে সরে গেছেন। আমার মতো অকৃতজ্ঞকে তিনি উল্টো ধন্যবাদ জানালেন—ধিক্বারে মাটির সাথে আমার মিশে যেতে ইচ্ছে করছে কোজেত! উনি মানুষ নন, উনি ফেরেশতা। বাবা, আপনার পদতলে বসে যদি আমার সারাজীবনও কেটে যায়, মনে হবে, তাও যেন কিছু নয়। আমার এ স্বপ্ন কোনদিন পরিশোধ হবার নয়।

হৃদয়ের সব কথা যেন উজাড় করে দিতে চায় ম্যারিউস। ভালজাঁ চুপ করে গুনছিলেন, কিন্তু আবেগ যে তাঁকেও বিচলিত করেছে, বোঝা গেল। ম্যারিউসকে বললেন,—যা সত্য তাই তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম। বসো, শান্ত হও।

—না, আপনি সবকিছু আমাকে জানাননি। সত্য মানে পুরো ঘটনা। আপনি আপনার সব কথা কেন জানাননি বাবা? আপনিই যে সেই মেয়ের মাদলেন, একথা কেন বলেননি? আপনি জাভেররকে বাঁচিয়েছিলেন তাও বলেননি? আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, সে কথা কেন বলেননি? কতদিন কতভাবে আমি জানতে চেয়েছি। আপনি সব সময় এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। বলুন বাবা, আমি কি অন্যায় করেছিলাম? ম্যারিউস ভালজাঁর দু'হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো।

—যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছি, তোমাকে জানিয়েছিলাম ম্যারিউস। আমি মনে করেছিলাম আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমার সরে যাওয়ার পালা।

—আমাদের ছেড়ে আপনাকে আর কোথাও থাকতে দিচ্ছি না বাবা। ম্যারিউস বললো,—আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। সত্যি বলছি আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আমরা। আপনি কোজেতের বাবা। আমারও বাবা! কাল থেকে আর এই বাড়িতে আপনার থাকা হচ্ছে না।

ভালজাঁ মান হাসলেন। ধীরে-ধীরে বললেন,—আগামীকাল! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে ম্যারিউস। কাল আর এ বাড়িতে রইবো না। কিন্তু তোমাদের বাড়িতেও আমি যাবো না ম্যারিউস।

ম্যারিউস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—সেকি! আপনি অন্য কোথাও যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, ম্যারিউস, আমি অন্যখানে চলে যাচ্ছি। যেখান থেকে কেউ আর কোনদিন ফিরে আসে না, আমি সেখানে চলে যাচ্ছি।

ম্যারিউস এবারও কিছু বুঝতে পারলো না। জাঁ ভালজাঁ ধীরে-ধীরে বললেন,—মৃত্যু আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমি পরপারে চলে যাবো ম্যারিউস।

কোজেত ও ম্যারিউস আতর্জনাদ করে উঠলো,—মৃত্যু! এসব কি বলছে বাবা! কিছুই যে বুঝতে পারছি না!

—হ্যাঁ, মৃত্যু—সেইতো স্বাভাবিক। ও কিছু নয়।

কোজেত ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—না বাবা, না। আমি তোমায় যেতে দেবো না। মরতে দেবনা। আমায় ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছে বাবা? না, আমি তোমায় যেতে দেবো না।

ভালজাঁ বললেন,—কেঁদো না মা-মণি। ম্যারিউস, তুমিও শান্ত হও। আমাকে মরতে বাধা করছো। বাতবতাকে কী কেউ কি রোধ করতে পারে? মৃত্যুর শীতল স্পর্শ

আখার দেহে আমি অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল পরপারের পাশে আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় তোমরা এলে। মনে হলো বুঝি ঋনিক বিরতি পেয়েছি সামনের কিছুক্ষণ।

এ সময় ডাক্তার এলেন। ভালজাঁ তাঁকে বললেন,—ওতদিন ও ওত বিদায় ডাক্তার! আসুন। এই আমার ছেলে-মেয়ে। ওরা একটু আগে এসেছে।

ম্যারিউস ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভালজাঁ কোজোতের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে যে তাঁর কি মায়া, প্রকাশের ভাষা নেই। মনে হচ্ছিল এই দৃষ্টি যেন শাস্ত্রত এক বাবার দৃষ্টি। অনন্তকাল যেন এই দৃষ্টি পরম আদরের কোজোতকে জড়িয়ে রাখতে চাইছে।

ডাক্তার ভালজাঁর নাড়ী দেখলেন। কোজোত আর ম্যারিউসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ম্যারিউসের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চবরে বললেন,—সব শেষ হয়ে আসছে।

কোজোতের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ভালজাঁ ম্যারিউসের দিকে তাকালেন। ঘরের মধ্যে নীরবতা, ভালজাঁর চোখে সেই পবিত্র শাস্ত্রত দৃষ্টি। ম্যারিউসের চোখে পানি চিকচিক করছে। ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকালেন ভালজাঁ। বললেন,—মৃত্যু আশ্চর্য কিছুই নয় ডাক্তার।

সহসা তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দেয়ালের তাকের দিকে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। ম্যারিউস ও ডাক্তার তাঁকে সাহায্য করতে গেল। কিন্তু দু'হাতে তিনি তাদের সরিয়ে দিলেন। তাঁর পায়ে যেন আগের মতো বল মিলে এসেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তিনি যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জুলে ওঠা প্রদীপের মতো যেন জুলে উঠেছেন।

দৃঢ় পদক্ষেপে দেয়ালের তাকের উপর থেকে ছোট একটি তামার ক্রুশ তুলে নিয়ে তিনি আবার চেয়ারে বসলেন। বেশ সুস্থ লোকের মতোই তিনি বসলেন কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। আবার তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। মনে হচ্ছিল তিনি ধীরে-ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন অতলে। কবরের শীতল পরশ তাকে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরছে যেন।

কয়েক মিনিট পর যেন এই দুর্ভাগ্য কেটে গেল। ভালজাঁ আবার যেন সেই আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠলেন! কোজোতের একটি হাত তুলে নিয়ে আলতোভাবে আদর করলেন।

ম্যারিউস চিৎকার করে বলে উঠলো,—ডাক্তার! বাবা বাঁচবেন ডাক্তার? আপনি একটু চেষ্টা করুন। মনে হচ্ছে বাবা ভাল হয়ে উঠছেন।

ভালজাঁ তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন,—বাস্তবতাকে রোধ করা যায় না, ম্যারিউস।

ধীরে-ধীরে আবার তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন। ঝি জিজ্ঞেস করলো,—একজন বিশপকে ডেকে আনিয়ে হতো!

ভালজাঁ তাকে বারণ করলেন। বললেন,—বিশপ তো আমার কাছেই রয়েছেন। এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না!

পায়ে-পায়ে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অন্ধকার দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি যেন কাকে খুঁজছেন। শ্বাস নিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। চোখে তার অজানা পৃথিবীর আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

কোজোত ও ম্যারিউসকে তিনি কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—আমি মরে গেলে তুমি কান্দবে কোজোত? আমার জন্য কোন দুঃখ করো না ম্যারিউস। একটি কথা বিশ্বাস করো, তোমাদের যে যৌতুক আমি দিয়েছি, তা সং ভাবেই উপার্জিত। আরেকটি কথা, আমার কবর নিরাভরণ রেখো। শুধু একটি পাথর দিয়ে স্মায়াগাটি চিহ্নিত করে রেখো। আর কিছু নয়। পাথরের বুকে আমার নাম লিখে রেখো না। তোমাদের মনে আমি চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই। আর কোজোত, তোমার মার নাম ফাটিন। যখন তাঁর নাম মনে করবে, তার জন্যে দৈশ্বরের কাছে দোয়া করো। সে বড় দুঃখী ছিল।

কোজোত কান্দছিলো। ম্যারিউসের চোখের কোণে পানি।

ভালজাঁ বললেন,—কেন্দো না মা-মনি, কেন্দোনা ম্যারিউস। আমিতো তোমাদের ছেড়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছি না। তোমাদের আমি সব সময় দেখতে পাবো। রাতে যখন তোমরা আকাশের দিকে তাকাবে; আমার হাসি দেখতে পাবে।

কোজোত ও ম্যারিউস কান্নায় ভেসে পড়লো। ভালজাঁর কোলে মাথা রেখে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দতে লাগলো। ধীরে-ধীরে ভালজাঁর মাথা পেছনের দিকে চলে পড়লো। মোমবাতির আলো তাঁর শান্ত সমাহিত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তাহলে মারা গেছেন। হ্যাঁ, সত্যি মারা গেছেন। আলো পাখী যেন অচেনা পৃথিবীর পানে পাখা মেলেছে চির দিনের জন্যে।